মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস

চিত্তরঞ্জন দাস

মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
সঙ্গতবাজার
মেদিনীপুর

মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতির পক্ষে মহাশ্বেতা দাস কর্তৃক,
সঙ্গতবাজার, মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত।

ভাদ্র, ১৩৬২

[illegible]তকুমার বসু কর্তৃক, শক্তিপ্রেস, ২৭।৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

পিতার বিপ্লবী জীবনে প্রেরণাদাত্রী
পিতামহীর শ্রীচরণে।

ভূমিকা

বিপ্লবী পরিবারের বিপ্লবী পিতা ও অগ্রজদের নিকট ও তাঁহাদের কর্ম্মবহুল জীবনের দ্রুত পটভূমিকায় শিশুকালে যাহা দেখিয়াছি ও যাহাতে প্রেরণা পাইয়াছি তাহার পরিপেক্ষিতে ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতির সংগৃহীত তথ্য সমূহের উপর নির্ভর করিয়া মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস রচিত হইল। এই পুস্তক চার খণ্ডে প্রকাশ করা হইবে। মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস এত ব্যাপক যাহা সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না। ১৯২০ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ইতিহাসের তথ্য সমূহ যদি পুরাতন কর্ম্মিগণ নিজ নিজ স্মৃতি হইতে লিখিয়া ও প্রামাণ্য দলিল ও কাগজপত্র দিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে খুব উপকৃত হইব।

চিত্তরঞ্জন দাস

মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় সম্বোদ্ধি ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ করিয়া এই সুবিশাল ও সুপ্রাচীন দেশের বহুবিচিত্র এবং নানা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। যদিও সূচনাতে আত্মবিশ্বাস আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং ত্যাগের মহিমোজ্জ্বল আদর্শ পরিপূর্ণ আবেগ লাভ করে নাই। তথাপি সমাজের সর্ব্ব স্তরে অল্পবিস্তর ইহার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়। কংগ্রেসের প্রচেষ্টা ও উদ্দীপনাতে যে সমাজ সংস্কার এবং শিল্প-সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয় তাহা সমগ্র দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির বিশেষ আনুকূল্য করে। বহুবিধ অবস্থা এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের সহায়ক হয়। এই অবস্থাগুলির মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ বিস্তার, পশ্চিমের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান সংযোগ এবং দেশের সুদূরবর্ত্তী অংশের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার অন্যতম।

সংগঠনের প্রথম পর্ব্বেই কংগ্রেস বিধান পরিষদকে (legislative council) আংশিকভাবে প্রতিনিধিত্বের উপর পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিধান পরিষদের অর্দ্ধেক নির্ব্বাচিত হইবে জনপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অক্ষম অজ্ঞ কৃষককুলের দ্বারা নহে। কিন্তু ঐ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসকমণ্ডলী আবার সাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইবে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট মতে পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করার বিধান ছিল। কংগ্রেস কেবলমাত্র চাহিয়াছিল ঐ বেসরকারী সদস্য সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেকে উন্নীত হোক এবং বেসরকারী প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হউন। এইরূপ বিধান পরিষদের বাজেটের উপর আলোচনার অধিকার থাকিবে তাহাদের উহা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ক্ষমতা থাকিবে। বিধান পরিষদের এইরূপ সংস্কার ও পরিবর্দ্ধনের পরিকল্পনা একান্তভাবেই নরমপন্থী বলিতে হইবে। কংগ্রেস তখন জন প্রতিনিধিত্বমূলক ভারতীয় কোনো সংস্থা অথবা পার্লিয়ামেণ্টারী প্রথার দাবী করে নাই। কংগ্রেসের দাবী উহাপেক্ষা অনেক স্বল্প। কংগ্রেস বিধান পরিষদকে অকিঞ্চিৎকর পরিহাসের সামগ্রীর পরিবর্ত্তে সত্যকারের প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা পরিষদে পরিবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল মাত্র। সরকারের পরামর্শের

জন্য বেসরকারী মতামতকে সুসংগঠিত রূপ দিতে কংগ্রেস চাহিয়াছিল। বেসরকারী মতামত তখনও গ্রহণ করা হইত। কিন্তু কংগ্রেস চাহিয়াছিল যে ঐরূপ পরামর্শ আর একটু আনুষ্ঠানিকভাবে ও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হউক। সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিবে। নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করা কংগ্রেসের ঈপ্সিত ছিল না—সে চাহিয়াছিল যে ঐ রাষ্ট্র ক্ষমতা যেন জনসাধারণের মতামত গ্রহণের পর প্রযুক্ত হয়।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ইংলণ্ড ও ভারতে জনমত গঠন, দরখাস্ত দাখিলের ব্যবস্থা এবং সরকারের নিকট দরবার করা প্রভৃতি ব্যবস্থা কংগ্রেস গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের কংগ্রেসের এই দীনতম দাবী পরিপূরণের বিন্দুমাত্র অভিলাষ ছিল না। ভারতে অবস্থিত ইংরেজের পত্রিকায় এই আন্দোলনকারীগণকে স্বপ্নদর্শী আদর্শবাদী, ক্লীব রাজদ্রোহ প্রচারক, আত্ম-প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি নিরাশপদপ্রার্থী, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভণ্ড আন্দোলনকারী প্রভৃতি অপবাদে কলঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিল। ভারতবাসীরা যদিও অতি অকিঞ্চিৎকর সুবিধা দাবী করিয়াছিল, তথাপি বারলো সাহেব সদম্ভে ঘোষণা করেন যে "সমস্ত সুবিধা দান বন্ধ কর, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা পূরণ করা অসম্ভব।" ভারতবর্ষ তখনকার অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিল এবং দেশে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল পট-ভূমিকায় সাধারণের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কংগ্রেস নেতারা সক্রিয় থাকা এবং অপেক্ষা করার নীতিকে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের দাবীকে সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া ধৈর্য্য সহকারে ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদদের চিত্ত জয়ের আশা করিয়াছিল। কংগ্রেসের অভিলাষ ছিল খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ভারতের বহুবিধ জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া ভারতবাসীকে একটি নেশন রূপে প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ আত্মসচেতন জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা স্বভাবতঃই রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাহী সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের দুয়ারে হানা দেওয়া। কংগ্রেস যে সব বহুবিধ সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়াছিল ও যে সব বিভিন্ন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছিল তাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে বহু ও বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও এ সমস্ত প্রয়াসের লক্ষবস্তু ছিল এক এবং অদ্বিতীয়। সূত্রেণ গ্রহিতা মণিগণা ইব এক একটি মণিকে বিচ্ছিন্ন দেখা গেলেও ঐ সূত্র তাঁহাকে একটি অখণ্ড মালার আকার প্রদানে ব্রতী ছিল। প্রারম্ভে কংগ্রেসের কার্য্যনীতি সম্পূর্ণ নূতন উদ্ভাবনারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বেকার কোনো নীতির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে নহে। এই

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ইহাকে উপযুক্ত মানুষ এবং উপকরণ সংগ্রহে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। প্রথম অবস্থাতে তাই কংগ্রেস দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের প্রতি সরকার ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ভারতীয় আমলাতন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কার বিরোধী ছিল এবং লর্ড কার্জ্জনের মধ্যে তাহারা একটি লৌহ কঠিন মানুষের সন্ধান পায়। তিনি মূর্খের মত প্রগতিপরিপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করেন এবং বঙ্গ বিভাগ করিয়া ভেদনীতির সহায়ে আন্দোলন খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ইহার ফল লর্ড কার্জ্জনের অনভিপ্রেত পথে সমস্ত দেশকে বিদ্যুৎ চমকের মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তকে ঐক্যবদ্ধ করিল। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস মধ্যকার ন্যাশনালিষ্ট পার্টির কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আবেদন নিবেদনের নিরামিষ নীতিতে ক্লান্ত বোধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে নূতন ভাগীরথী প্রবাহে চালিত করিবার কথা ভাবিতে সুরু করিলেন। কিন্তু এই নবীন ও প্রগতিপন্থী চিন্তার বিরুদ্ধে স্থির প্রজ্ঞ নেতাগণ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের এবং দেশবাসীর সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া উহার বিরোধিতা করিলেন। ফলে দেশবাসী চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল।

ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী যদি দেশবাসীর অনভিপ্রেত কর্ম্মে স্থিরপ্রতিজ্ঞও থাকে তাহা হইলে আবেদন নিবেদন ও অনন্ত ধৈর্য্যের সার্থকতা কোথায়? এই সংসারের সুর ভারতবাসীর বিশেষ করিয়া তরুণ মনের উদ্ভাবনী ও কল্পনাশ্রয়ী মনে ক্রমেই অধিকতর উচ্চগ্রামে মুখর হইয়া উঠিল যে নরমপন্থীদের অনুসৃত পথে অভীষ্টলাভ করিতে হইলে শতাব্দী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেও হইবে না। তাহারা অধিকতর বৈপ্লবিক পথে আরও দ্রুত অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনার কথা ভাবিতে লাগিল। তাহারা এশিয়া ও আফ্রিকার ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিয়াছিল। ১৮৯৪ সালে একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী আদোয়াতে আক্রমণকারী ইতালীয় চমূকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। অতএব প্রতীচ্যের অপর শক্তি ইংলণ্ড ও কি সত্যই অপরাজেয় এই ভাবনা তরুণ মনে দোলা লাগাইল। তরুণ ভারত কংগ্রেসের মধ্য পন্থা ও রাজভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। সময়টি বিভিন্ন দিক হইতে শুভ ইঙ্গিতময় ছিল। বুয়োর যুদ্ধের কাহিনী সকলে স্মরণ করিয়াছিল। অসংগঠিত অশিক্ষিত স্বল্প অস্ত্র সজ্জিত কৃষক সৈন্যদল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের সুশিক্ষিত গর্ব্বিত সৈন্যদলকে কিভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল

না। প্রতীচ্যের অপরাজেয়তার আস্ফালন ম্লান হাওয়ায় প্রাচ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কয়েক যুগ ধরিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রাশিয়ার যে বৃহৎ শক্তি সম্পর্কে সংস্কারভাব পোষণ করিয়াছে সেই সুবৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি রাশিয়াকে এশিয়ার একটি অতি ক্ষুদ্র দেশ জাপান শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল ১৯০৪-১৯০৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে। রুশ জাপান যুদ্ধের ফলাফলের উপর আত্ম-সচেতন এশিয়া জন্মলাভ করিল এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সারা ভারতে জাপানের এই বিজয় গৌরব অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ জাগাইয়াছিল। ভারতবাসীর মন যখন প্রাচ্যের বিজয় গৌরবে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করিয়াছে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ বিভাগের বজ্রনির্ঘোষ শুনা গেল।

অতুলনীয় বাধাবিঘ্ন এবং অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও পরশাসিত এই জাতির মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশবাসীর মধ্যে ত্যাগী, আত্ম-প্রত্যয়শীল বুদ্ধিমান, দৃঢ় কর্ম্মনিষ্ঠ দেশপ্রেমী একটি শ্রেণী গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আত্ম-প্রত্যয়শীল এই যে সচেতন জনসমষ্টি কংগ্রেস গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল ইহাই তখন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতীয় যুব শক্তিকে নৈতিক সাহসও আত্মবলিদানে প্রবুদ্ধ সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা পরায়ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কংগ্রেস এবং ইহা তাহার অন্যতম অবদান, স্বেচ্ছাসেবক গঠন করিয়া কংগ্রেস তাহার কার্য্যের সুবিধা করিয়াছিল ত বটেই অধিকন্তু তাহাদের জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত নাগরিক সৈনিকে পরিণত করিতেও কংগ্রেস প্রেরণা দিয়াছিল।

রাণাডে, তিলক, গোখেল, পরাঞ্জপে, চাপেকর প্রমুখ ব্যক্তির উপযুক্ত নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরা স্বরাজ্যের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নিদারুণ ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিল। তাহারা মহারাষ্ট্র যুবকদের জাতীয় উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিল! শোভাযাত্রায় লাঠি ও তরবারির ক্রীড়া এবং বিভিন্ন ব্যায়াম কৌশলের প্রদর্শন সুরু হইয়াছিল। ব্রিটিশ বিদ্বেষ সযতনে প্রচার করা হইত। তাহাদের লইয়া ড্রিল করান হইত। তাহারা ভারতের হিন্দুস্থান নামকরণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব উদযাপিত হয়। শিবাজী স্মৃতিস্তম্ভ পুনর্গঠিত হয়। দামোদর ও রামকৃষ্ণ চাপেকর হিন্দুজাতির বাধাবিঘ্ন দুরীকরণের জন্য পুনায় একটী সংস্থার পত্তন করেন। তাহারা শিবাজী মহারাজের আদর্শে সাহস ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারত হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নের সঙ্কল্প

প্রচার করেন। প্লেগ নিবারণের অজুহাতে ১৮৯৫ সালে বোম্বাই অঞ্চলে মিলিটারী এবং স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের উপর নিদারুণ নিপীড়ন আরম্ভ করে। গোখেল তাঁহার কেশরী পত্রিকায় এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় কারারুদ্ধ হন। জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত অন্যায় আচরণের জন্য দায়ী মিলিটারী অফিসার এবং প্লেগ কমিশনারকে ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকর পুণাতে উৎসব আনন্দের মধ্যে হত্যা করেন। দামোদর ধৃত হন এবং ফাঁসীর মঞ্চে দেশ সেবার পুরস্কার পান। দামোদরকে যে দুই ভ্রাতা গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহারাও বিপ্লবীর প্রতিহিংসার অনলে প্রাণ হারায়। এই অপরাধে চাপেকর সমিতির চারিজন সদস্যের ফাঁসী হয়। সমিতিটি নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হইলেও ঐ আন্দোলন গোপনে স্পন্দিত ও প্রসারিত হইতে থাকিল এবং এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল যে চাপেকররা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা করিতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় ছিলেন, তিনি বাংলার তদানীন্তন অবস্থার দৃষ্টে ব্যথিত হইলেন। অরবিন্দ রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব মেধার সাহায্যে আই, সি, এস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বরোদা রাজ্যের চাকরী গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা বারীন ঘোষ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার সামাজিক সংস্কার ও বিপ্লব আন্দোলনের পিতা হিসাবে রাজনারায়ণ বসুকে অভিহিত করিত। অন্ততঃ পক্ষে মেদিনীপুরে তাঁহার নিকট হইতে জনসাধারণ নূতন নূতন আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। বরোদায় অবস্থানকালে অরবিন্দ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের মধ্যে চাপেকর সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ দলভুক্ত হন। তিনি তিলকের সংস্পর্শে আসেন এবং উভয়ে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হন। এইরূপে তাঁহার বৈপ্লবিক আদর্শ ও চেতনা একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তিনি ১৯০২ সালে তাঁহার সহোদর বারীনের সঙ্গে বিপ্লবী দল গঠনের জন্য বাংলাদেশে আসেন।

কিন্তু কিছুদিন পরেই নিরাশ হইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অরবিন্দ বাঙালী তরুনের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নরমপন্থী পরিচালিত কংগ্রেস কখনই

আবেদন নিবেদনের পথ পরিবর্জ্জন করিবে না। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্য শাসকের নিকট হইতে আবেদন নিবেদনের সাহায্যে কখনই স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। সেইজন্য তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের পন্থায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনুবর্ত্তী হইতে চাহিয়াছিলেন। যদিও তিনি বাংলায় এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতায় ব্যর্থ মনোরথ হন, কিন্তু তিনি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুস্পুত্র এবং তাঁহার মাতুল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর মনে গভীর রেখাপাত করিতে সক্ষম হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং পিয়ারীলাল ঘোষ মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং ছাত্র সাধারণের উপর তাঁহাদের নিবিড় প্রভাব ছিল। তাঁহারাই বিপ্লবের শিখা প্রজ্বলিত রাখেন এবং পুণা হইতে বিপ্লবের বীজ মেদিনীপুরের মাটিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মেদিনীপুর কালেক্টোরেটের সমীপবর্ত্তীস্থানে যখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্র নাথের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছা-সেবকদের লইয়া তাঁহার বিপ্লব প্রচেষ্টাকে রূপ দিবার প্রয়াসী হন। তাঁহার এই দুর্দমনীয় ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে হত্যার অভিযোগে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে শাসন তান্ত্রিক সুবিধার হেতুবাদে বঙ্গ-বিভক্ত হইয়া গেল। দার্জ্জিলিং বাদে এবং মালদা সহ চট্টগ্রাম ঢাকা এবং রাজসাহী বিভাগ লইয়া সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙলা এবং আসাম লইয়া যে প্রদেশ গঠিত হইল তাহা বাঙলা দেশ হইতে পৃথক একটি অঞ্চলে পরিণত হইল। এই নূতন প্রদেশের নাম পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম হইল। এদিকে সম্বলপুর জেলা এবং আরও পাঁচটি ওড়িয়া ভাষী জেলা মধ্যপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যা বিভাগে সংযুক্ত হইল। পরিবর্ত্তে বাঙলা মধ্যপ্রদেশকে পাঁচটি দেশীয় নৃপতি শোভিত রাজ্য ছাড়িয়া দিল। এই রাজ্যগুলির অধিবাসী হিন্দীভাষী ছিল।

বঙ্গ বিভাগের ফলে এই দেশে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। এই ঘটনার ফলে যে বিপ্লব প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইল তাহাই ক্রমে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক অভিযানে পরিণতি লাভ করিল। ভারতের তরুণ প্রাণে জাতীয়তা বোধই ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। কলিকাতায় এবং সমস্ত জেলাতেই চরমপন্থী দল গঠিত হইল। তাঁহারা শাসন তান্ত্রিক আলোড়ন তথা অহিংস পন্থা পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করিল না। এই চরম পন্থীগণ বঙ্গ-বিভাগকে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না। তাহারা ইহাকে জাতিবর্ণ বিশ্বাস

আচার অনুষ্ঠান সর্ব্ব বিষয়ে এক জনসংখ্যার মধ্যে কৃত্রিম কীলকরূপে অভিহিত করিল। তাহাদের ধারণা হইল এই কৃত্রিম ও অন্যায় বিভাজনের উদ্দেশ্য হইল একটি জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা মাত্র। তাহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিল যে তাহাদের ধ্যানের বাংলা এবং ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার ঘৃণ্য চক্রান্তকে সর্ব্বশক্তি দিয়া প্রতিহত করা হইবে। রাজপ্রতিনিধির নিকট এই মর্ম্মে স্মারক লিপি সমূহ প্রেরিত হইতে লাগিল কিন্তু তিনি অর্থ পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। ষাট হাজার মানুষের সহিযুক্ত একটি সুবিশাল দরখাস্ত পার্লিয়ামেণ্টে এই পরিকল্পনা বাতিলের জন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু সকল আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইল। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই ব্যবস্থাকে অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবধারিত (settled fact) বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয়তাবাদী তিলক, অরবিন্দ বিপিন পাল প্রমুখের কার্য্যকরী প্রচারের ফলে কংগ্রেসের মধ্যেও নরম পন্থা পরিহার করিয়া পরিবর্ত্তনীয় পশ্চাৎপটে নূতন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা দেখা দিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসী কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্ব্ব প্রথম দক্ষিণ অথবা নরম পন্থী এবং বাম অথবা চরমপন্থী দলের মধ্যে স্পষ্ট সুস্পষ্ট বিভেদ প্রকাশ পাইল। নরম পন্থীগণ ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থভুক্ত অন্যান্য সুশিক্ষিত ডোমিনিয়নের অনুকরণে জননির্ভর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিল অবার বামদল ব্রিটিশের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের পত্তন চাহিয়াছিল। দুই দলের বিভেদ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু বঙ্গ বিভাগ রোধ করা তাহাদের এক অভিন্ন উদ্দেশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস ভারতের আপামর সাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রচারে বিরত ছিল। কংগ্রেসের আবেদন এতদিন ভারতের অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত ছিল। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল যে এই দেশে এবং ইংলণ্ডে সুতীব্র আন্দোলনের সাহায্যে ব্রিটিশ জাতিকে প্রবুদ্ধ করা সম্ভব হইবে যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছায় ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার করিবে এবং ভারতবাসী স্বশাসনে উপযুক্ত হইবে। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সযত্ন মৃদুতা সত্ত্বেও উহার আদর্শ প্রচারে তরুণ মনে সুনিবিড় জাতীয় চেতনা এবং শাসক শক্তির প্রতি বিরূপতা জন্মলাভ করিল। সরকারের অনাবরণ রূঢ় প্রত্যাখ্যান এবং রণংদেহী ভাব বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের শক্তি ও উন্মাদনা অপূর্ব্ব আবেগে উদ্বুদ্ধ হইল। সরকার বঙ্গ

বিভাগকে অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা (settled fact) রূপে ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী উহাতে অসম্মত এবং হতাশার মধ্যেই সাহস অর্জ্জন করিল। দেশীয় শিল্প সংস্থার সংরক্ষণের পরিকল্পনা বহুদিন যাবৎই ছিল। এই নূতন পরিস্থিতিতে লোকে ব্রিটিশের প্রস্তুত সামগ্রী বর্জ্জনের কথা চিন্তা করিতে সুরু করিল। এই সময় কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার বহুল প্রচারিত সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ্যভাবে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের আহ্বান জানাইলেন। এই ডামাডোলের সময় অরবিন্দ তাঁহার বরোদা রাজ্যের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন হলে নেতৃবর্গের ঐতিহাসিক সভায় এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত ও বিবেচিত হইবার পর এই অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে সর্ব্বপ্রকার বিদেশী সামগ্রী বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৯৯৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টাউন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের সুত্রপাত হইল। ভারতীয় সমস্যার প্রতি ব্রিটিশ জাতির নিদারুণ উপেক্ষা এবং তাহার সরকারের জনমতের প্রতি একান্ত অবজ্ঞার প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত বিলাতী সামগ্রী ক্রয় হইতে বিরত থাকিবার আন্দোলন চালু হইল। এইভাবে ১৯০৫ সালের বিলাতী বর্জ্জন তথা স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই স্বদেশী আন্দোলন তথা বিলাতী বর্জ্জন পরবর্ত্তীকালে গণ-চেতনার উদবোধনে সবিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল।

কলিকাতা টাউন হলের অনুসরণে মেদিনীপুরেও ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট অনুরূপ বিক্ষোভের ব্যবস্থাপনা হইয়াছিল এবং বেলী হলে ছাত্রদের মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় সহস্র ছাত্রের সমাবেশে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় যে বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কোনো প্রকার প্রমোদে যোগদান করিবে না এবং সযত্নে বিলাতী সামগ্রী পরিহার করিবে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত হইল। স্থানীয় হিন্দু স্কুল প্রাঙ্গণে ২রা সেপ্টেম্বর একটি ছাত্র সমাবেশ হইল। মেদিনীবান্ধব পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ ঐ সভায় পৌরহিত্য করেন। গতিকৃষ্ণবাগ সভারম্ভে একটি জাতীয়তা উদ্দীপক সঙ্গীত পরিবেশন করিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্র সমাজকে বিলাতী বর্জ্জনে সবিশেষ তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া বাণী দিলেন। এ সভায় সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী সামগ্রী সরবরাহের জন্য ছাত্র সমাজের উদ্যোগে আশু একটি "ছাত্র-ভাণ্ডার" স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গবিভাগ আদেশের প্রতিবাদে

মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজ ১০শে সেপ্টেম্বর হইতে তিনদিনের জন্য পাদুকা, কোট এবং ছাতা ব্যবহার করিবে না এইরূপ স্থির করিল ঐদিন তাহারা একটি মহতী পদযাত্রায় সহরের সমস্ত প্রধান পথগুলি পরিভ্রমণ করিল। সমস্ত ছাত্র নগ্ন পদে একটি পতাকা বহন করিয়া ঐ পদযাত্রায় যোগ দেয়। তাহারা কতকগুলি জাতীয় চেতনাময় সঙ্গীত গাহিতেছিল। জেলার শাসন কর্তৃপক্ষ ঐ শোভাযাত্রার বিরোধী হইল। পুলিশের বড়কর্ত্তা ঐ শোভাযাত্রার লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু পিয়ারীলাল ঘোষ নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া ঐ শোভাযাত্রার লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্মত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ঐ শোভাযাত্রার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ঐ দিনের প্রবল বারিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া নিদারুণভাবে ভিজিয়া ভিজিয়াও তাহারা শোভযাত্রার অনুগমন করে। তাহার পরবর্ত্তী সাপ্তাহিক ছাত্রসভায় বহুলোক যোগদান করে। ঐ সভায় কলিকাতা আগত ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং মেদিনীপুর রাজের ম্যানেজার কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ভাষণ দান করেন এবং প্রচারকবৃন্দ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাহার পর একটি অতিবৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হইল। তখন স্থানীয় ইদ উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি সমেত সুবৃহৎ জনসমাবেশ হইত ঐ উৎসব উদযাপন করিতে। ছাত্রবৃন্দ ঐ জনসমাবেশের সুযোগ হারাইল না। পাঁচটি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ঐ জনসমাবেশের উদ্দেশে ছাত্রবৃন্দ বক্তৃতা দিয়া তাহাদের আদর্শ প্রচার করিয়াছিল। ছাত্রগণ প্রতিটি কেন্দ্রে সভানুষ্ঠানের প্রারম্ভে জনসমাবেশের জন্য সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছিল।

শুধুমাত্র মেদিনীপুর সহরেই নহে, ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচরোল, ঘাটাল, মহিষাদল, কাঁথী, মীরগোদা, বাবরতার হাট প্রভৃতি বহু স্থানে অনুরূপ সভানুষ্ঠান হয়। দেশীয় করকচ লবণ মেদিনীপুর বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ১৯০৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর লবণের দাম সের প্রতি আরও এক পয়সা কম করা হইল। সকালে সন্ধ্যায় ছাত্রবৃন্দ বড়বাজার এলাকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রেতা সাধারণকে বিলাতী সামগ্রী ক্রয় হইতে নিরস্ত করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে কেবলমাত্র তাহারা অনুরোধ উপরোধ এবং নিরুপদ্রব বাধা সৃষ্টি করিত। তাহাদের প্রচেষ্টা প্রায়শই সফল হইত এবং ফলে দোকানদারগণের কিছু ক্ষতি হইতে লাগিল। পুলিশের সহায়তায় দোকানদারেরা ঐ আন্দোলন

বিনষ্ট করিতে ব্রতী হইল। তাহারা যদি আন্দোলনে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় দেশীয় সমগ্রী বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে এইরূপ সঙ্ঘর্ষ ও তিক্ততার সৃষ্টি হইত না। তাহারা সহরের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমক্ষে বিলাতী সামগ্রী পরিবর্জ্জনের শপথ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে লঘুচিত্তে তাহারা বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া শপথ ভঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু শুধু ইহাই নহে ক্রেতা সাধারণের মনে সযত্নে তাহারা দেশীয় সামগ্রীর অপকর্ষ এবং বিলাতী দ্রব্যের উৎকর্ষের কথা বলিয়া তাহাদের প্রভাবিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। মেদিনীপুরের বণিকগণের খুবই ক্ষতি হইতেছিল এবং সেইজন্য তাহারা পথচারী ছাত্রবৃন্দের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইতেছিল। তাহারা ছাত্রদের আচরণ সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং কলেজের পদাধিকার বলে মেদিনীপুর কলেজের প্রেসিডেণ্ট কে, বি, দত্তকে এবং হিন্দুস্কুলের সেক্রেটারী কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে বলিলেন ছাত্রদের বে-আইনী কার্য্য-করিতে যেন নিষেধ করা হয়। বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনে স্থানীয় বণিক ও দোকানদারদের অনমনীয় অসহযোগিতায় কেবলমাত্র দেশীয় সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য একটি দোকান চালু করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিল। সরল গ্রাম্য অধিবাসীদের প্রবঞ্চনা করিয়া দোকানদারেরা বিদেশী বস্ত্রকে দেশীয় বলিয়া চালাইতে থাকায় এই প্রয়োজন আরও অত্যাবশ্যক হইয়া দেখা দিল। ফলে মেদিনীপুর বড়বাজারে দশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া স্বদেশী ভাণ্ডার বিপণি স্থাপিত হইল। জেলার তন্তুবায়দের জন্যে একটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও গৃহীত হইল।

২৪ সেপ্টেম্বর কলেজ ময়দানে রঘুনাথ দাস, উপেন্দ্রনাথ মাইতি এবং আরও তিনজন উকিলের উদ্যোগে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারের নিমিত্ত একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হইল। আট সহস্রের অধিক জনসমাবেশ হইয়াছিল ঐ সভায়। পতাকা হস্তে ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক আয়োজিত প্রায় কুড়িটি চমৎকার শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তন ও ব্যাণ্ড বাদক সহযোগে সহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে আসিয়া বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ ময়দানে সমবেত হইতে লাগিল। সুপরিচিত এবং সদ্য রচিত বিভিন্ন জাতীয় সঙ্গীতের উন্মাদন মন্ত্রে দিক দিগন্ত মন্ত্রিত হইয়া উঠিল। বাংলা এবং উর্দ্দুতে বিভিন্ন ভাষণ প্রদত্ত হইল। বহু জনপদবাসী সমেত সমবেত জনতা অখণ্ড অভিনিবেশ সহকারে ভাষণ শুনিল। সহরের সমস্ত বিশিষ্ট পণ্ডিত, জমিদার এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তি সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুজন সন্ন্যাসীও সভায় যোগদান করিয়াছিল। আটটি মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কে, বি, দত্ত কেন্দ্রীয় মঞ্চ হইতে ভাষণ দান করেন। অন্যান্য মঞ্চ হইতে পি, কে, বসু, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, মতিলাল মুখার্জ্জি, পিয়ারীলাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রামচন্দ্র চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণলাল ব্যানার্জ্জী শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। একজন তরুণ মুসলমানের উর্দ্দু বক্তৃতা এত আকর্ষণীয় হয় যে জনতা অন্ধকার রাত্রি পর্য্যন্ত তাহা অখণ্ড মনোযোগে শ্রবণ করে এবং মুসলমানদের উপর উহার প্রভাব বিশেষ স্থায়ী হয়। ইতিপূর্ব্বে মেদিনীপুরে স্বদেশ প্রেমের এরূপ বন্যা কখনও দেখা যায় নাই। জনতা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে আর কখনও বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার না করিবার সঙ্কল্প লইয়া গৃহে ফিরিল। ঐ সভাতেই জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইল। এই ব্যাপক জনসমাবেশ পূজা অবকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে হওয়ায় স্বাদেশিকতার পূতাগ্নি সুদূর পল্লী প্রান্তে উকিল, মোক্তার, আমলা ছাত্র প্রভৃতির দ্বারা পরিবাহিত হইল। এই আদর্শ প্রচারের জন্য পল্লীর দূর প্রান্তেও বহু সভা-সমিতি আয়োজিত হইল। সমস্ত প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে এবং মল্লিকদের রাসমঞ্চ প্রাঙ্গণে তুইটি সভায় মিলিত হইয়া এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন যে যে পরিবারে বিলাতী চিনি অথবা বিলাতী লবণ ব্যবহৃত হইবে তাহাদের জাতিচ্যুত করা হইবে এবং কেহই তাহাদের গৃহে কোনো প্রকারে পৌরহিত্য করিবেন না। এই সিদ্ধান্তের ফল সুদূর প্রসারী হইল এবংবিলাতী চিনি ও লবণ আর বাজারে থাকিল না।

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দার্জ্জিলিং ও মালদহ জেলা বাদে রাজসাহী বিভাগ, চট্টোগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ লইয়া আসামের সহিত যুক্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ নামধেয় একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। ইহার প্রতিক্রিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ সমেত মেদিনীপুরে অভাবিত-রূপে অনুভূত হইল। মেদিনীপুরের জনগণ এই উপলক্ষ্যে সক্রিয় হইয়া ১৬ই অক্টোবর তাহারা সভায় মিলিত হইয়া এই জাতীয় শপথ বাণী গ্রহণ করিল। "বাঙালীর সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সরকার যখন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পর্ব্ব সমাধান করিল তখন আমরাও আমাদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের দেশ বিভাগের অবসান কল্পে আমাদের সাধ্য সম্মত সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হইব এই শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং তাহা ঘোষণা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।" সহস্র সহস্র ব্যক্তি

নগ্ন পদে নগ্ন দেহে শোভাযাত্রা সহকারে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কাঁসাই নদীতে উপনীত হইল এবং স্নান ও তর্পণ অন্তে একতা ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল এবং সমবেত উদাত্ত কণ্ঠে বন্দে মাতরম মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর ও মাতৃভূমির নামে শপথ গ্রহণ করিল যে তাহারা ঐক্যবদ্ধ থাকিবে এবং কোনো পার্থিব শক্তিই তাহাদের বিভক্ত করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা আরও প্রতিজ্ঞা করিল যে যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বাতিল না হইবে ততদিন তাহারা সযত্নে বিলাতী বর্জ্জন করিবে। তাহারা সমস্ত দিন উপবাসে কাটাইল। ঐদিন সমস্ত দোকান বন্ধ থাকিল এবং সমস্ত কাজকর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদ বন্ধ হইল।

বাঙ্গালায় বয়ন শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাঁথীতে একটি বিপুল জন সমাবেশ হইল। সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল "আমরা কাঁথা মহকুমার অধিবাসীবৃন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আমাদের প্রিয় দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পর্কে সজাগ হইয়া শপথ গ্রহণ করিতেছি যে বাঙ্গালা দেশে সুতা প্রস্তুত কার্য্য ও বয়ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমাদের একদিনের উপার্জ্জন দান করিব।"

এই প্রস্তাব বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কর্তৃক উত্থাপিত ও মুন্সী মহীউদ্দিন কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল। ঐ সভায় বনবিহারী মুখার্জ্জি, প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, দ্বারিকানাথ ধর এবং বিধুভূষণ গিরি উদাত্ত ভাষায় ভাষণ দেন। জন-সাধারণের মনোভাব হইতেও বুঝা গিয়াছিল যে তাহারা অবস্থার গুরুত্ব ও পবিত্রতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল। সমস্ত মহকুমা সহরে এবং বহু গ্রামেও "আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি—বঙ্গব্যবচ্ছেদ, রাখী বন্ধন অরন্ধন মাতৃতর্পণ" ক্রিয়াদি সযতনে লোকে সম্পন্ন করিয়াছিল। বাঙালা বিভক্ত হইলেও অখণ্ড বঙ্গ চিরস্থায়ী হউক এই বাণী সোচ্চারে ঘোষিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের জনগণ কেবলমাত্র কাগজে কলমে নহে, তাহাদের ঐতিহ্য সম্মত স্বভাবের সম্পূর্ণ আবেগ ও নিষ্ঠা সহকারে ঐ বিশেষত্ব পূর্ণদিবসটি উদ্‌যাপন করিয়াছিল। পূজাবকাশে মেদিনীপুরের প্রায় সমস্ত সহরেই প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় ও তত্ত্বাবধান রাখা হয় যাহাতে জনগণকে বিদেশী সামগ্রী বর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করা যায়। জেলার সদরে প্রতি সন্ধ্যায় বিভিন্ন রাজপথে জাতীয় সঙ্গীত সহকারে শোভাযাত্রা হইতে লাগিল, ইহার মধ্যে কতগুলি সঙ্গীত সুগীত হইয়া ও পরস্পর আবৃত্ত হইয়া এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল যে মাতাল ও শিশুরাও উহা আয়ত্ত করিয়াছিল এবং সহজ প্রবৃত্তি বলে

অহরহ তাহারা তাহা গান করিতে সুরু করিল। জাতীয় আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রচার মূলক বক্তৃতা প্রায় প্রতি নিয়ত বিবৃত হইত। তথাপি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানেই এরূপ বক্তৃতা হইত সেখানেই জনতা ভীড় করিয়া জমা হইত। সহরের উপকণ্ঠে এমন কি সুদূর পল্লীতেও বহু সার্থক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বুঝা গিয়াছিল স্বদেশী দ্রব্য, বিশেষ করিয়া কাপড়ের সুপ্রচুর সরবরাহ করা গেলে বিদেশী দ্রব্যের কাটতি বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে। কেবলমাত্র স্বদেশী পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের জন্যই সমস্ত সহরে এমন কি অনেক গ্রামেও বহু দোকান স্থাপিত হইল আর পুরাতন দোকানগুলিতেও সর্ব্বশ্রেণীর স্বদেশী সামগ্রীতে ভরিয়া গেল।

১লা নভেম্বর সোয়ান সাহেবের হাতায় জাতীয় একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। চন্দ্রকোণার মোহান্ত মহারাজ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাণীর ঘোষণা (Queen's proclamation) এবং জনগণের ঘোষণা সময়োপযোগী নীরবতার মধ্যে পঠিত হইল। একটি জাতীয় তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি পৃথক দিবস ধার্য্য হইল। ত্রৈলোক্যনাথ পাল, পিয়ারীলাল ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, পি, কে, বাসু, মহেন্দ্রনাথ দাস এবং কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ঐ সভায় ভাষণ দিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীকে, বি, দত্ত এবং রঘুনাথ দাস মহাশয় ও ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

২১শে অক্টোবর সকাল ৬টায় স্বদেশী সমিতির উদ্যোগে একটি জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশক শোভাযাত্রা পাহাড়ীপুর হইতে সুরু করিয়া সহরের সমস্ত প্রধান রাজপথ পরিক্রমণ করিল এবং রাখীবন্ধন উৎসবের উপযোগী অনবদ্য জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা জনচিত্তে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহারা সহরের বিশেষ বিশেষ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাও পরিক্রমণ করিয়াছিল এবং বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকের হাতে রাখী বন্ধন করিয়া দিয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় কখনই ঐ রাজনৈতিক উৎসবে আপত্তি প্রকাশ করে নাই। বহু রাজপথ ঘুরিয়া অবশেষে ঐ অভিযাত্রীদল নাড়াজোল রাজপ্রাসাদে উপনীত হইল এবং রাজা ও কুমারের হাতে রাখী বন্ধন করিয়া দিল। রাজাও ঐ অভিযাত্রীদলকে একটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত গোলাপগুচ্ছ উপহার দিলেন এবং বালকদের মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। তাহারা কর্ণেল গোলা মীরবাজার, শিববাজার হইয়া বড়বাজারে সমিতি গৃহে বেলা ১২টায় উপনীত হইল। তাহারা আবার বেলা ৩টায় সমবেত হইল এবং প্রভাতে পূর্ব্বদিকের যে অঞ্চলে যাইতে পারে

নাই সেই দিকে যাত্রা করিল, পথে তাহারা রাখী বাঁধিতে বাঁধিতে চলিল এবং অবশেষে বল্লভপুরের চন্দ্রাকর ময়দানে সমবেত হইল। এইখানে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইল। জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা সভার সূচনা হইল এবং সভাবসানেও জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল—সভাশেষে প্রচণ্ড শব্দে বন্দে মাতরম্ ও আল্লাহো আকবর ধ্বনি উদ্‌গীত হইতে লাগিল। পুনরায় ঐ স্থান হইতে আর একটি শোভাযাত্রা সুরু হইয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করিল। বিলাতী সামগ্রী বিক্রেতা বড় বড় দোকানগুলিতে ছাত্র-বৃন্দ পিকেটিং করিতে লাগিল। বণিকগণ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যোগজীবন ঘোষ এবং আর একটি ছেলের বিরুদ্ধে বিলাতী বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া এবং তাহাদের উপর সালফিউরিক এ্যাসিড্ নিক্ষেপ করার অভিযোগে একটি ফৌজদারী মামলা রুজু করিল। ছাত্রবৃন্দও তাহাদের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগে একটি পাল্টা মামলা রুজু করিল। বণিকগণ কে, বি, দত্ত মহাশয়কে তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করিয়া প্রত্যাখাত হইল তিনি ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বণিকেরা জেলায় তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজ্ঞকেও স্বপক্ষে না পাইয়া মামলায় সোলেনামা করিতে বাধ্য হইল। ঐ দলের সর্দ্দার অখিল চাবরী এবং গঙ্গানারায়ণ দত্ত কৃপা প্রার্থনা করিয়া করুণ ভাবে আবেদন করিল। ছাত্রবৃন্দকে প্রহার করিবার জন্য খেসারৎ স্বরূপ এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে এবং প্রকাশ্যে কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, তবেই তাহাদের বিরুদ্ধে দাখিলী মামলা তুলিয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যে সাধারণভাবে একঘরে করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। উঁহারা সম্মত হইলে ফৌজদারী আদালতে সমবেত বিপুল জনতা ও ছাত্রবৃন্দের উপস্থিতিতে উহারা মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল এবং এক হাজার টাকা নগদ প্রদান করিল। স্বদেশী দলের এই অভূতপূর্ব্ব বিজয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মন্দ্রিত হইয়া উঠিল। সমস্ত মামলাগুলি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইল। উকিল, মোক্তার এবং ভুবনেশ্বর মিত্র ও তাঁহার সুযোগ্য জামাতা শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর উদ্যোগে ডাক্তারদের দ্বারা বর্জ্জিত হওয়ার প্রতিক্রিয়াতে উহারা অবদমিত হইল।

বালবৃদ্ধ ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের বিপুল উচ্ছ্বাস উদ্দীপনার মধ্যে এই স্মরণীয় বর্ষের অবসান হইল। এ যেন কোন অদৃশ্য হস্তের সুগভীর প্রভাব সমস্ত সমাজকে এক বিপুল আবেগে আন্দোলিত

করিয়া দিল—সমস্ত যুক্তি, বিচার বিবেচনা স্তব্ধ করিয়া সমগ্র সমাজের মানস চেতনাতে এক এবং অদ্বিতীয় দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব্ব প্রভাব পরিলক্ষিত হইল। এই অনবদ্য ভাবোচ্ছ্বাস হইতেই বাঙলাদেশের নব পর্য্যায়ে জাতীয়তা বোধের জন্ম হইল। ভারতে যে বিপ্লবের অগ্নিতেজ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহাতে অগ্নিশিখা সংযোগ করিতে বাঙলা তথা মেদিনীপুরের বিপ্লবী দল বিলম্ব করিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবীদল প্রতিষ্ঠিত হইল—বঙ্গ ভঙ্গ রোধের আন্দোলনের সুযোগে বিপ্লব প্রচার চলিতে লাগিল। জনচিত্তে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য এই বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে ব্যবহার করার গুরুত্ব নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। এই বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে তরুণ মনে এইরকম এক মানসিক প্রস্তুতি আনিয়া দিয়াছিল যে স্বাধীনতার বাণী অতি সহজেই গৃহীত হইবে। নেতৃবৃন্দ এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত একদল তরুণকে এই কার্য্যে ব্রতী করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই তরুণদিগকে সুকঠোর শৃঙ্খলা, গভীর ধর্ম্মবোধ, একান্তভাবে আত্মত্যাগ এবং সুগভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন যাহাতে তাহারা দেশের ডাককে সর্ব্বাগ্রগণ্য বিবেচনায় দ্বিধাহীনচিত্তে তাহার জন্য জীবন দানে অগ্রনী হইবে। তদানীন্তন সরকারের রূপ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এমন কি আবশ্যক মত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার নীতিতে গোপন দল গঠিত হইল। তাহারা রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর মত দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা সুনিশ্চিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক নিরামিষ প্রচারের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। বরোদা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অরবিন্দ সরকারী স্কুল ও কলেজ বর্জ্জন করিয়া জাতীয় বিদ্যায়তন সৃষ্টির মানসে সংগঠিত জাতীয় শিক্ষা সংসদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নূতন জাতীয় পত্রিকা বন্দে-মাতরমের সম্পাদক হিসাবে বৃত হইলেন এবং তাহার মাধ্যমে তিনি জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য আত্ম-নির্ভরতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এই দুইটি পন্থার নির্দ্দেশ দিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত সন্ধ্যা, ভূপেন দত্ত সম্পাদিত যুগান্তর, নবশক্তি, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, দেবদাসকরণ সম্পাদিত মেদিনী-বান্ধব প্রভৃতি পত্র পত্রিকা জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করিয়া নূতন ইতিহাস রচনা করিলেন।

এই সব পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশ্য বিদ্রোহই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা এইরূপ প্রচারই হইতে থাকিল। এই সমস্ত পত্র পত্রিকা বিপ্লবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল। বিপ্লববাদীরাও বিলাতী সামগ্রী বর্জ্জন এবং স্বদেশী পণ্য প্রস্তুতের কথা প্রচার করিতে লাগিল। জাপান যে প্রকার দুর্জ্জয় সাহসে ইউরোপের মদ গর্ব্বিত শক্তি রাশিয়ার মোকাবিলা করিয়াছিল, সেইরূপ অনমনীয় দৃঢ়তা ও বিপুল বিক্রমে এই বঙ্গ ভঙ্গের অপমানের প্রতিরোধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। বাঙালীর কি কোন ধর্ম্ম নাই, তাহার কি দেশপ্রেম নাই, বাঙালী স্মরণ করুক তাহার শক্তির দেবী কালীকে তাহারা শক্তি অর্জ্জন করুক, তাহারা মহারাষ্ট্রবীর মহারাজ শিবাজীর অপূর্ব্ব কৃতিত্ব স্মরণ করুক, তাহারা সামগ্রিকভাবে বিদেশী সামগ্রী বর্জ্জন করিয়া বিদেশী সরকারের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করুক, তাহারা স্বদেশী পণ্য সম্ভার নিজেরাই প্রস্তুত করুক—এইরূপ প্রচারে তাহারা ব্রতী হইল। তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লব এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সাধারণের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করিতে তাহারা উদ্যোগী হইল। এই উদ্দেশ্য সাধনে তখনকার পত্র পত্রিকাগুলিকে ব্যবহার করা হইতেছিল—উহাতে ব্রিটীশ শাসকের বিরুদ্ধে কুৎসা ও নিন্দাবাদ প্রকাশ করিয়া পাঠকবৃন্দকে তথা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান আনিতে আহ্বান জানান হইত। নেতৃবৃন্দের প্রেরণা ও শিক্ষায় তরুণ দল বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইল, অস্ত্রশস্ত্র বোমা ও অতি বিস্ফোরক সামগ্রী সংগৃহীত হইতে লাগিল। ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং বারেন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক ১৯০৬ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশ্য ভাবেই প্রচার করিল যে উহার একান্ত উদ্দেশ্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান করা। এই আদর্শমতে ১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে একটি প্রবন্ধে তরুণ দলের সংগঠন আহ্বান করিয়া স্বাধীনতার জন্য স্থানীয় জনমত গঠনের আবেদন করা হইল। ১৯০৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী বিপ্লবের বাস্তব রূপ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাশব শক্তির দ্বারা বিপ্লব আনয়নের জন্য জনমত গঠনের জন্য আহ্বান জানান হইল। ১৯০৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় আরও স্পষ্টভাবে বিপ্লবের জন্য জনমত গঠনের আহ্বান জানান হইল। উক্ত প্রবন্ধ সংবাদ পত্র, জাতীয় সংগীত, সাহিত্য, প্রচার, গোপন সম্মেলন, এবং দল গঠনের দ্বারা জনমন গঠনের উপায় নির্দ্দেশ জানাইল। ১৯০৭ সালের ৩রা মার্চ্চের প্রবন্ধে অর্থ সংগ্রহের আহ্বান জানান

হইল এবং আবশ্যকমত চুরী ডাকাতি করিয়াও অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হইতে বলা হইল এবং উহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই বরং অবস্থা গুণে উহাই ধর্ম্ম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইল। ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিলের সংখ্যায় অশান্তি আলোড়ন কামনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল এবং উহাই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া উক্ত হইল এবং এইরূপ অবস্থাই বিদ্রোহের সূচক বলা হইল। যুগান্তর পত্রিকায় সত্যই জাতীয় জীবনে যুগান্তর আনিবার মানসে বিভিন্ন প্রবন্ধে যুদ্ধ রক্তপাত এবং হত্যা ও মৃত্যুবরণের কথা প্রচারিত হইত। কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইলেও যুগান্তরই একমাত্র পত্রিকা নহে যাহাতে জাতীয়তাবাদ তথা বিপ্লবের উদ্দীপনা প্রচারিত হইত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত সন্ধ্যা পত্রিকাতেও ব্রিটিশ জাতির তীব্র কুৎসা ও কলঙ্ক প্রচার করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে সাধারণকে উত্তেজিত করা হইত। ১৯০৭ সালের ২৯শে এপ্রিলের সংখ্যায় ইহা প্রচারিত হইল যে ইংরাজ জামালপুরে হিন্দুদের নিকট হইতে লাঠি ছিনাইয়া লয় এবং তাহায় পর গুণ্ডারা আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে ও দাঙ্গা করে। উহাতে বলা হয় যে ইংরাজ যদি বন্দুক রাখিবার অনুমতি প্রদান না করে তাহা হইলে আত্মরক্ষার জন্য বোমা নির্ম্মান করিতে হইবে। ৬ই মের সংখ্যায় অপর একটি প্রবন্ধে কালী প্রতিমা অপবিত্র ও কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনার কথা প্রচার করা হইল এবং লেখক জানাইল যে কালীমাতার বোমা নামক এক প্রকার বোমা প্রস্তুত হইতেছে এবং সকলকেই অন্ততঃ একটা করিয়া বোমা গৃহে রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইল। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আরও স্পষ্ট কথা বলা হইল—আমরা এখনও প্রস্তুত হইতে পারি নাই। ফিরিঙ্গীরা আমাদের নিকট হইতে সমস্ত বন্দুক ছিনাইয়া লইয়াছে এবং সেই বন্দুক দেখাইয়া আমাদের উপর নির্যাতন করিতেছে। কিন্তু এই ক্রটী সাশোধিত হইতেছে। এইরূপ হাত বোমা তৈয়ারী হইতেছে যাহা উহাদের বন্দুকের সহিত পাল্লা দিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ বোমা প্রস্তুত হইলে পর দেখা যাইবে পুলিশের কর্ত্তারা কিভাবে আমাদের উপর নির্য্যাতন চালায়। যুগান্তর এবং সন্ধ্যা ব্যতীত অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইত। যুগান্তরের প্রকাশিত উত্তেজনাকর প্রবন্ধগুলিই একপ্রকার পুর্নমুদ্রণ "মুক্তি কোন পথে" এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বিভূতিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। "বর্ত্তমান রণনীতি"-তে প্রথম অধ্যায়েই রণোন্মাদনা সৃষ্টিকর লিখন ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসকল্পে এই অধ্যায়ে

তখনকার অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ, বাহিনী সংগঠন প্রণালী ও যুদ্ধ প্রণালী, বিভিন্ন রণকৌশল সম্বলিত তদানীন্তন রণনীতি সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট রচনা লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রচার করা হইল যে অত্যাচারের প্রতিবিধান অন্য উপায়ে না হইলে যুদ্ধই একমাত্র পন্থা। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের জন্য কর্ম্ম অপরিহার্য্য এবং এই কর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্যই হিন্দুরা শক্তি পূজার সূচনা করিয়াছিল। "মুক্তি কোন পথে" দস্যুতার দ্বারা অর্জ্জন করিয়াও অর্থ সংগ্রহ সমীচীন বলিয়া মত প্রকাশ করিল। এই পুস্তকে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতির কঠোর সমালোচনা করা হইল। তখনকার আন্দোলনে নবাগত মুক্তি যোদ্ধাদের কর্ম্মপদ্ধতির একটি প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করা হইল।" বর্ত্তমানে যে সব চালু ঘটনাবলী সম্পর্কে আন্দোলনে নেতারা আমাদের যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছে সে বিষয়ে এইসব দল নিজ নিজ মত ও পথ অনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু এই সব দলের সভ্যগণ জাতীয় মুক্তিপথী আন্দোলনকারীদের পুরোভাগে থাকিবার উদ্যমেই ব্রতী থাকিবে। বর্ত্তমান অবস্থাতে আমাদের দেশে সক্রিয় কর্ম্মপন্থার এবং উহার পরিপোষক আন্দোলনকারীর অভাব নাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে বাঙালীরা সর্ব্বত্রই দেশপ্রেম ও জাতীয় স্বাধীনতা যজ্ঞের হোতা স্বরূপ আগাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আন্দোলনকারীগণ যদি হৃদয়ে দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত না করিয়াই আগাইয়া আসে তাহা হইলে প্রকৃত শিক্ষা ও শক্তি অর্জিত হইবে না। সেই জন্য এই সকল মাতৃমন্ত্রে নবদীক্ষিত যুবককে সদা সর্ব্বদা অতন্দ্র প্রহরীর মত জীবন দানে উন্মুখ থাকিতে হইবে এবং দেশবাসীকে ব্রিটিশ দলনে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে সদা উত্তেজিত রাখিবার জন্য নিরলস কর্ম্মে ব্রতী হইতে হইবে। এই পুস্তকে আরও বলা হইয়াছিল যে ইউরোপীয়দের গুলী করিয়া হত্যা করিতে খুব বেশী দৈহিক শক্তির আবশ্যক হয় না এবং কঠোর সঙ্কল্প থাকিলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব। আরও বলা হইয়াছিল যে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ভারতীয়দের অস্ত্র নির্ম্মাণ পদ্ধতি শিক্ষা করিবার জন্য বিদেশে পাঠান যাইতে পারে। ভারতীয় সৈন্যদের সহায়তা ও সহযোগিতাও পাওয়া আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে দেশের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাইতে হইবে। বিপ্লবী সংস্থা যতদিন প্রাথমিক অবস্থায় থাকিবে ততদিন খরচাপাতি চাঁদা সংগ্রহের দ্বারা চলিতে পারে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর শক্তি প্রয়োগে সমাজের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে হইবে। বিপ্লব যখন সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তখন সমাজের

নিকট হইতে ঐ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা অন্যায় নহে। সমাজের অকল্যাণ সাধক বলিয়াই ডাকাতি অপরাধ ইহা স্বীকার্য্য কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকাতি সমাজের মহত্তর কল্যাণের জন্যই এবং "সেই কারণেই সামান্য ক্ষতি সাধন পাপ ত নহেই বরং ইহাতেই সমধিক পুণ্য। সেইজন্য যদি বিপ্লবীগণ সমাজের কৃপণ অথবা বিলাসী ধনীর নিকট হইতে শক্তি প্রয়োগে অর্থ ছিনাইয়া লয় তাহা হইলে তাহাদের কার্য্য নিশ্চয়ই অন্যায় নহে।"

"মুক্তি কোন পথে" পাঠকবৃন্দকে দেশীয় সৈন্যদের সাহায্য অর্জ্জনে প্রয়াসী হইতে উপদেশ দেয়।·· ···যদিও ঐ সব সৈন্য তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শাসক কুলের সরকারে চাকুরি গ্রহণ করিয়াছে তথাপি তাহারাও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, তাহাদেরও অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি রহিয়াছে এবং সেই কারণে যখন বিপ্লবীরা তাহাদের নিকট দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার করুণ চিত্র ধরিয়া তুলিবে তখন তাহারাও একদিন শাসকবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই বিপ্লবীদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে।······সৈন্যদের এইভাবে বিদ্রোহী করিতে ও বিপ্লবীবের পথে আনা সম্ভব বিবেচনা করিয়াই শাসকশক্তি কোনো বাঙালীকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে দেয় না।······বিদেশী শক্তির সহায়তাতেও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা যাইবে।"

বঙ্গভঙ্গের বহুপূর্ব্বেই মেদিনীপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র দাস কানুন গো ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে গোপন সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুমুখী এবং অতন্দ্র প্রয়াস আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথম কার্য্য হইবে গোপন ষড়যন্ত্র। তাঁহাদের মতই ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহারা দল গঠনে মনোনিবেশ করেন। দেহ গঠনের ও শরীর চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সংস্থাতে তাঁহারা প্রথম কার্য্য সূচনা করেন। তাহারা স্বদলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে আনিতে সক্ষম হইলেন এবং বিপ্লব মন্ত্র কিছু কিছু প্রচার করিতে পারিলেন কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা খুব সামান্য সাফল্য লাভ করায় তাঁহারা নিরাশ হইলেন। তাহার পর বঙ্গ বিভাগের সুযোগ আসিল যখন বিপ্লব মন্ত্র প্রচারের পক্ষে উহা বিশেষ সুযোগ সুবিধা আনিয়া দিল। তাঁহাদের স্বপ্নের স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণের উপযোগী তরুণ মন এই উপলক্ষ্যে প্রচুর পাওয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র দলটি এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নরমপন্থী, গরমপন্থী, জমিদার, ব্যবহারজীবি, বণিক, ছাত্র এমন কি রাজানুরক্ত শ্রেণী পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে যোগদান করিল। এই অভূতপূর্ব্ব পরিস্থিতিই

মেদিনীপুরে বিপ্লবপ্রচেষ্টায় বিশেষ অনুকূল হইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ অরবিন্দ ঘোসের জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে আমাদের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন ও আন্দোলনের একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য হইতেছে স্বাধীনতা। তিনি বলিলেন যে জাতীয়তাবোধ ঈশ্বরের সৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ইহার মৃত্যু অসম্ভব কারণ ঈশ্বর জনমনে এই বোধ সদা সঞ্চারিত করিতেছেন—মানুষের অন্তরস্থিত এই ঈশ্বরময় আত্মার বিনাশ নাই এবং ইহাকে কখনই কারাগারে নিক্ষেপ করা সম্ভব নহে। তিনি প্রচার করিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান জাতীয়তাবাদ প্রাচীন সন্ন্যাসধর্ম্ম ও ম্যাজিনি পরিকল্পিত আদর্শের সুষম সমন্বয়ে সৃষ্ট। বন্দে মাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা, মুক্তি কোন পথে ও বর্ত্তমান রণনীতি প্রভৃতি পত্র পত্রিকা ও পুস্তকে যে আদর্শ ও নীতি বিধৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতিও আদর্শ তিনি জনমনে অনু-প্রবিষ্ট করিতে প্রয়াসী হইলেন। তরুণ মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে দেবদাস করণ কর্ত্তৃক মেদিনীপুরে একটি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইল। তরুণ হৃদয় প্রস্তুত হইলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহাতে ধর্ম্মবোধও সঞ্চারিত করিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শমতে শক্তির প্রতীক কালীর রূপান্তর ভবানীদেবীর পূজা প্রচলিত হইল। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক পুস্তক, অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দেরও অন্যান্য সাধু সন্তের বাণী সমস্তই পঠিত হইত ও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। এই সমস্ত বইয়ের সাহায্যে কর্ম্মীবৃন্দ দেশাত্মবোধের মধ্যে সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকবোধ অনুপ্রবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ডিগবী লিখিত প্রসপারাস ইণ্ডিয়া, রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, দেউস্করের লেখা দেশের কথা প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রচারিত হইত। ম্যাজিনির অদ্ভুত কর্ম্মাদি, জগতের সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতাগণের জীবনী, নেপোলিয়নের কাহিনী, ফরাসী বিপ্লবের ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং জার্ম্মানীর ঐক্য-বিধায়ক কাহিনী, গ্যারিবল্ডিও কাভুরের জীবনী ইত্যাদি মেদিনীপুরের নব দীক্ষিত বিপ্লবীদের প্রেরণা ও আদর্শ যোগাইল। বিপদ সঙ্কুল দুর্ম্মদ জীবন গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ শিখান হইত। সেবা ও আত্মোৎসর্গের বাসনা ও আগ্রহ জন্মাইবার মত মন তৈয়ারাই ছিল শিক্ষা দীক্ষার উদ্দেশ্য। নিষ্ঠুর হৃদয় হীনতা নয় নিপীড়িত মানুষের সহিত মমত্ববোধ ও সহধর্ম্মিতাই ছিল বিপ্লবীর চরিত্র। ব্যায়ামাগার আখড়া

প্রভৃতির মাধ্যমে নবদীক্ষিত বিপ্লবীদের শরীর সংগঠনের এবং বিপ্লবীদের পীড়িত ও ক্লিষ্ট মানুষের সেবায় কঠোর শ্রমের ব্যবস্থা হইল। ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর আড়ম্বর শূন্য জীবন উহাদের আবশ্যিক বলিয়া অভিহিত হইল। বিলাস ব্যসন আরাম ও সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের উর্দ্ধে থাকিবার প্রেরণা দেওয়া হইল। নিপীড়িত ক্লিষ্ট-মানুষের প্রতি কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভয়হীন, কঠোর ও সাহসী হইতে এবং দৃঢ় পদে সংগ্রাম করিবার মন্ত্র তাহাদের দেওয়া হইল। তাহাদের কর্ত্তব্য নিষ্করুণ ও কঠোর বলা হইত। নবদীক্ষিত বিপ্লবী তথা জনসাধারণের চিত্তে উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি ও বহাল রাখিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতীয় সঙ্গীত রচিত ও গীত হইতে লাগিল। এই বিষয়ে বিশিষ্ট কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী গোষ্ঠচন্দ্র চন্দ্রের বিশেষ অবদান ছিল। গোপন সভা হইতে লাগিল এবং গুপ্তসমিতি গঠিত হইল। শিবাজী উৎসব পুনরায় চালু হইল। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিবাজী মহারাজের সফল সংগ্রামের আদর্শে বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহজ পন্থা তাহারা দেখিয়াছিল।

১৯০৬ সালে হিন্দুমেলা নামে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টনের সভাপতিত্বে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী পুরাতন জেল প্রাঙ্গনে আয়োজিত হইয়াছিল। গোসাই দাস দত্ত সম্পাদক ছিলেন এবং মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক রামচন্দ্র সেন স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাপটেন ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভাইস ক্যাপটেন হইয়াছিলেন।

সমগ্র জেলার বিভিন্ন অংশ হইতে বহুলোক ঐ প্রদর্শনী দেখিতে ভীড় করিয়াছিল। ইহারাই কি আমাদের রাজা এই শিরোনামা যুক্ত বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলির ভার পড়ে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক ক্ষুদিরামের উপর। জাতীয়তাবাদী কর্ম্মী ও পত্র পত্রিকাগুলির উপর অত্যাচারকারী ভীতি প্রদর্শনকারী ও শাস্তিদানকারী শ্বেত রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা করিবার প্ররোচনামূলক ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও প্রকট উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বাণী উক্ত পুস্তিকায় ছিল। ১৯০৬ সালের ১লা এপ্রিলের বেলা ১টার সময় ক্ষুদিরামকে একজন পুলিশ ইনসপেক্টর একজন সাব-ইনসপেক্টর ও ১০ জন সশস্ত্র কনষ্টেবলের সহায়তায় বন্দেমাতরম তাঁতশালার প্রাঙ্গণে গ্রেপ্তার করিল। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ও ৫০৫ ধারা মতে পরোয়ানা বাহির করেন এবং তাহার জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া জেল হাজতে তাহাকে প্রেরণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন

কালেকটরীতে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন বিভাগের আমলার কার্য্য করিতেছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষুদিরামের মামলা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র চাকুরী হইতে বরখাস্তের নোটীশ তিনি পাইলেন। ২০শে এপ্রিল তারিখে পিয়ারীলাল ঘোষ ক্ষুদিরামের জামিনের আবেদন করিলেন এবং ক্ষুদিরাম বালক মাত্র এই বিবেচনায় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডি ওয়েষ্টন ৫০০ টাকার জামিনে তাহার মুক্তির আদেশ দিলেন। পিয়ারীলাল জামিন পত্র দাখিল করায় ক্ষুদিরামকে জেল হাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। মামলাটি ১৬ই এপ্রিল এই মেদিনীপুর রাজদ্রোহ মামলার প্রাথমিক শুনানী সুরু হইল এবং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দেব ক্ষুদিরামকে দায়রা সোপার্দ্দ করিলেন এবং তাহাকে আবার জেল হাজতে পাঠান হইল। পরদিন দায়রা জজ মিঃ র‍্যানসম তাহাকে ১০০ টাকার জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন এবং ক্ষুদিরাম আবার জামিনে মুক্ত হইল। ১৫ই মে দায়রা জজ মিঃ এইচ, ই, র‍্যানসামের এজলাসে ক্ষুদিরামের বিচার সুরু হইল। মেদিনীপুররাজের তখনকার ম্যানেজার আশুতোষ রায় এবং প্রাণগোবিন্দ দাস এ্যাসেসর নিযুক্ত হইলেন। সরকারী উকিল জে, এন হালদার এম, এ, বিল মামলার উদ্বোধন করিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলিলেন যে ক্ষুদিরামের মত বালককে কঠোর দণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে এই মামলা দায়ের করা হয় নাই। রাজদ্রোহ কখনই কোনো প্রকারে বরদাস্ত করা হইবে না ইহা ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য ক্ষুদিরামের সামান্য দণ্ড বিধানের জন্য মাত্র ঐ মামলা চালু করা হইয়াছে। কে, বি, দত্ত, মতিলাল মুখার্জ্জি, পিয়ারীলাল ঘোষ, সাতকড়ি পতি রায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ পাল আসামীপক্ষ সমর্থন করিলেন। ডি, এস, পি, মিঃ আর কাস্‌ল্ ললিতমোহন এবং গোঁসাইদাস দত্ত সরকারী সাক্ষী হিসাবে উঠিলেন। পরবর্ত্তী দুজনের কেহই আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিলেন না এবং মামলাটি পরদিনের জন্য মুলতুবী রাখা হইল। আসামী বালকমাত্র এবং অপরের হস্তের ক্রীড়নক মাত্র হিসাবে কার্য্য করিয়াছে এই অজুহাতে পরদিন সরকারী উকিল জজ সাহেবের সকাশে মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনুমতি প্রদত্ত হইল এবং ক্ষুদিরাম সসম্মানে খালাস পাইল। উভয় দিনই আদালত কক্ষ ছাত্র, উকিল, মোক্তার প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—তিল ধারণের স্থানও ছিল না। কে বি দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত একটি গাড়ীতে চাপাইয়া প্রচুর মাল্যভূষিত করিয়া ক্ষুদিরামকে ছাত্ররা

উহা নিজেরাই টানিয়া উল্লসিতচিত্তে সমস্ত রাস্তা পরিক্রমা করিল। ক্ষুদিরাম সেদিন বীরের মর্য্যাদা পাইয়াছিল।

এইভাবে ১৯০৬ সাল অতিক্রান্ত হইল। যদিও অতিবৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজীকে প্রেসিডেন্ট করিয়া এবং চরমপন্থীদের কিছু কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের বিভেদ কোনোমতে এড়ান গেল, কিন্তু নরম পন্থীরা কোনো ক্রমেই তিলক, অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্রের চরমপন্থী নীতি সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। ইহা সকলের নিকটই সুস্পষ্ট হইল যে যদিও ঐ অতিবৃদ্ধ লোকটির উপস্থিতিতে সঙ্ঘর্ষ আপাততঃ এড়ান গেল, কিন্তু উভয় দলের সঙ্ঘর্ষ ও বিভেদ অনিবার্য্য।

তরুণের দল দ্রুত কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনে প্রয়াসী। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন অন্ততঃ স্থানীয়ভাবেও একপ্রকার নূতন দেশাত্মবোধ ও আবেগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল। ভারতীয় শিল্প কৃষ্টি ও কলা-শিল্পের পুনরুজ্জীবন করিবার এষণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত সামাজিক প্রথা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলিল। পর্দা প্রথার মত কু-অভ্যাস বিদূরিত হইতে সুরু করিল। এই আন্দোলনের ফলে জাতিভেদ শিথিল হইতে শুরু করিল এবং জাতিতে জাতিতে পার্থক্য কমিয়া যাইতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান সুরু হইল। রবীন্দ্র রচিত 'সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে,' 'ও আমার দেশের মাটি,' 'নিশিদিন ভরসা রাখি,' 'এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে,' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,' 'বাঙলা দেশের হৃদয় হোতে কখন আপনি,' 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,' 'যদি তোর ভরসা থাকে' প্রভৃতি অমর সঙ্গীত এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ জনমনে আবেগ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শোভাযাত্রায় গীত হইয়া তরুণ মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল—

জীবন আহবে চল
চল ! চল !! চল !!!
বাজবে সেথায় রণভেরী
আসবে প্রাণে বল !
চল ! চল !! চল !!!
ছেড়ে দিয়ে সুখ দূরে রেখে মান
বীর সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর দাপে কাঁপবে ধরা,
করবে টলমল !
চল ! চল !! চল !!!

ঘরে থেকে ভাই, সুখ কি আছে?
লাগুক জীবন দেশের কাজে
জীবন গেলে জীবন পাবে
হবে জনম সফল!
চল! চল!! চল!!!
উঠিছে দেখ তরুণ তপন
ফুটেছে কতই আশার কিরণ,
ঐ অস্ত্রে বুক বেঁধে ভাই,
আয়রে দেব দল
চল! চল!! চল!!!

তখন শত শত মেদিনীপুরবাসী যে সমস্ত গান গাহিত ও চর্চ্চা করিত, এইটি তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র। জনমত গঠনে ও আবেগ সঞ্চারে সংকীর্ত্তন, বাউলগান, কবিগান, যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতির বিশেষ অবদান ছিল।

১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে স্বদেশী আন্দোলন ও গুপ্ত সমিতি ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হইতে লাগিল এই বৎসরও আবার কৃষি শিল্প মেলা আয়োজিত হইল। ঐ মেলায় প্রেসিডেণ্ট হইলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টন সেক্রেটারী হইলেন ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়। সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ বন্দেমাতরম ব্যাজ ধারণ করিবার জন্য এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি করিবার অধিকার চাহিল। ডিষ্ট্রিক্ট জজ দরবাল সাহেব যদিও ইহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু ওয়েষ্টন সাহেব ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট জর্জ্জ সাহেব দরবালের মধ্যস্থতায় এইভাবে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন যে মেলার উদ্বোধনে বন্দেমাতরম গান করা চলিবে এবং তখন কোনো ইউরোপীয় থাকিবেন না—কিন্তু বন্দেমাতরম ব্যাজ ধারণ করা চলিবে না। কিন্তু ইহাতেও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটসম্মত না হওয়ায় ছাত্রেরা মেলা বর্জ্জন করিল এবং সেক্রেটারীও পদত্যাগ করিলেন এবং কোনো স্বেচ্ছাসেবকই পাওয়া গেল না। মেদিনী বান্ধব পত্রিকায় দেবদাস করণ ঐ মেলা বর্জ্জনের জন্য প্রচার করিতে লাগিলেন। বহু প্রদর্শক তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া ফিরিয়া গেল এবং অবশিষ্টরাও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিল। এইভাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনমনীয় জিদের ফলে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড হইল, কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী কর্ম্মচারী ও উকিল বাবুদের

স্বেচ্ছাসেবক করিয়া ঐ প্রদর্শনী চালু রাখিতে প্রয়াস পাইলেন এবং প্রদর্শনীতে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটার আনয়ন করিলেন। প্রদর্শনীর প্রথম রজনীতে যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজ সাহেব থিয়েটার দেখিতে লাগিলেন তখন ছাত্রবৃন্দ সর্ব্বদিক হইতে সমস্বরে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে সুরু করিল। ফলে তাহারা বিরক্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার জন্য ইহার পর হইতে দেবদাস করণ উকিলদের সমালোচনার পাত্র হইয়া পড়িলেন।

এতদিন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ উকিলদের লইয়াই কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইত —বৃহত্তর জনসমাজ ইহা হইতে দূরেই ছিল। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীনাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ কংগ্রেসের মধ্যে নূতন নূতন লোক আনিতে ও জন-সংযোগ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠণ আবশ্যক অনুভূত হইল। এই উদ্দেশ্যে ২১শে এপ্রিল তারিখে বেলী হলে একটি সভা আহুত হইল। আপোষ অসম্ভব হইল কারণ উকিলবাবুরা দেবদাস করণকে জেলা কংগ্রেস কমিটি হইতে বাদ দিবার স্বঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিল সভা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী হইয়া গেল।

মেদিনীপুরে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বহু ছাত্র উহাতে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। এই বৎসর সরকার মেদিনীপুর জেলা বিভাগ করিতে মনস্থ করিল এবং হিজলীতে ৮০০০ বিঘা জমি এই কারণে খরিদ করিল। বিভাগীয় কমিশনর মিঃ হেয়ার মেদিনীপুর পরিদর্শনকালে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা সভায় প্রকাশ করিলেন যে মেদিনীপুর জেলার বিভাগ নিশ্চিতভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে এবং উহা শীঘ্রই কার্য্যকরী করা হইবে। এই জেলা খুব বড় হওয়ায় একজন অফিসারের পক্ষে শাসন করা দুরূহ। জেলার প্রস্তাবিত বিভাগ করিতে প্রারম্ভে আট লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক দেড়লাখ টাকা ব্যয় হইবে। দ্বিতীয় জেলার সদর খড়্গাপুরে হইবে। মেদিনীপুরবাসী আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তাহারা এই পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী হইল আর প্রকৃতপক্ষে সেই কারণেই সরকার এই জেলাকে বিভক্ত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। লোকে প্রশ্ন করিতে শুরু করিল যে সরকার কি মেদিনীপুরে আর একটি পূর্ব্ববঙ্গ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী। তাহারা সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়াদিল যে এই অপচেষ্টা নিরুপদ্রবে লোকে মানিয়া লইবে না। এই প্রস্তাব অবশ্য তখনকার মত মুলতুবী করা হইল।

অসাধু মহাজন ও মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর দ্বারা অবলম্বিত

পীড়ন মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও তাহাদের ভূ-সম্পত্তি খোওয়া যাওয়ায় যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল সে বিষয়ে মেদিনীপুরের কিছু সাঁওতাল অবহিত হইল এবং রেভারেণ্ড এ, এল কেনানের মাধ্যমে তাহারা সরকারের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিল। এই আবেদন পত্রে কালেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন অনুমোদন করিলেন যে প্রাচীন ছোটনাগপুর এ্যাক্টের ১০ (ক) ও (খ) ধারাগুলি মেদিনীপুরেও প্রযোজ্য করা হউক। কমিশনর মিঃ ই. এইচ. সি ওয়ালস ইহাতে সম্মত হইলেন কিন্তু মন্তব্য করিলেন যে এই বিষয়ে নূতন আইন করাহউক এবং সমস্ত প্রদেশকে উক্ত আইনের আওতায় আনা হউক।

জঙ্গল মহলে প্রধানতঃ জমিদার জমিনদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধুমায়িত হইতে লাগিল। জঙ্গল মহলের অধিবাসীবৃন্দ বিশেষ করিয়া গড়বেতা তরফ পশ্চিম গোষ্ঠীয় লোকেরা জমিদারী কোম্পানীর পীড়নমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী নীলচাষের কারবারও করিত। নীলের দাম কোম্পানী অত্যন্ত কম করিয়া ধরিত এবং কোম্পানীর অসাধু কর্ম্মচারীবৃন্দ আবার অনেকরকম বাজে আবায়াব (বেআইনী ঘুষ) কৃষকদের নিকট আদায় করিত। এইভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হইত বলিয়া কৃষকরা কোম্পানীর জন্য নীল চাষ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত। কোম্পানীর সত্ত্বীয় কতক কতক জমিতে স্থানীয় লোকের বিনা শুল্কে গোমহিষাদি চরাইবার অধিকার ছিল। কোম্পানী স্থির করিল যে এই অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া তাহারা গোমহিষাদির চারণভূমি সীমিত করিবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবরে তাহারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অফিসার পাঠাইয়া এ চারণভূমি সীমা চিহ্নিত করিবার জন্য আবেদন করিল। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অবহিত না থাকায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার জন্য সরকারী সক্রিয় সমর্থন জানাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু কোম্পানী কতকগুলি বিশেষ ভূমি চিহ্নিত করিতে অগ্রণী হইল, যে ভূমির উপরই কেবলমাত্র লোকে গোমহিষাদি চরাইতে পাইবে। ১৮৯৩ সালের ৪ঠা মে তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সকল ভূমির তালিকা প্রকাশ করিয়া প্রজা সাধারণের উপরোক্ত বিষয়ে কিছু আপত্তি আছে কিনা ব্যক্ত করিতে নির্দ্দেশজারী করিল। বহু আপত্তি দাখিল হইল কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে ঐ সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করা হইল। অক্টোবর মাসে কোম্পানীর নগদীরা প্রজাসাধারণের চিরন্তন অধিকার হানি করিয়া

বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র গোচারণে বাধা দিল। কোম্পানীর অসংখ্য অত্যাচারে এবং বিশেষ করিয়া তাহার কর্মচারীবৃন্দের অনাচারে লোকের নাভিশ্বাস দেখা দিল। তাহারা বাধা দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইল এবং কোনোপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন ব্যতিরেকেই এতদুদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সংস্থাসমূহ গড়িয়া উঠিল। জমিদারী কোম্পানীর জমিদারীর মধ্যে এই যথেষ্ট গোচারণ বন্ধের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় প্রত্যেকটি লোক রুখিয়া দাঁড়াইল এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ঐ অঞ্চলে খাজনা বন্ধ হইল, কোম্পানীর সমস্ত পুকুর ও বাঁধের মাছ লুট হইল। জঙ্গলের কাঠ যথেচ্ছ কাটা সুরু হইল এবং কোম্পানীর লোকেরা প্রহৃত হইতে লাগিল। কোম্পানীও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সমস্ত এলাকাতে পুলিশ সাহায্যে ১৪৪ ধারা জারী করিল। কোম্পানী প্রজা সাধারণের বিরুদ্ধে অজস্র ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়ের করিল এবং প্রজানির্যাতনে ও মারধোরে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিল। পুলিশ সর্ব্ব সময়ই কোম্পানীকে সাহায্য করিতে লাগিল। এবং অবশেষে প্রজা সাধারণ প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আদালতের শরণাপন্ন হইল এবং সাতটি মামলা রজু হইল। তাহারা বর্ণনা করিল যে ঐ সব ভূমিতে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বিনা বাধায় স্মরণাতীতকাল হইতে এবং বিশবর্ষের বহু বহু উর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া অবাধে গোমহিষাদি চারণ করিয়াছে। তাহারা তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কোম্পানীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচারের আবেদন করিল। কোম্পানী পক্ষে জবাবে বলা হইল যে নালিশী ভূমিতে প্রজা সাধারণের এরূপ কোনো অবাধ চারণ অধিকার নাই বা ছিল না এবং আরও দাবী করিল যে এতাবৎ বাদীগণ লাইসেন্সী হিসাবে মাত্র উপযুক্ত খাজনা দিয়া ঐ সকল জমিতে গোমহিষাদি চরাইয়াছে এবং সেইজন্য আইন অনুসারে তাহারা কোনো অধিকার অর্জ্জন করে নাই তাহারা আরও বলিল যে অনুরূপ অধিকার স্বীকৃত হইলে তাহাদের :স্বাধিকারের বিশেষরূপে হানি হইবে। গড়বেতার মুন্সেফ নীলচাষের জমি ব্যতিরেকে সমূহ জমির উপর বাদীপক্ষের দাবী মোতাবেক অবাধ গোচারণের অধিকার স্বীকার করিলেন এবং বিবাদী কোম্পানীকে প্রজাদের ঐরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করিলেন।

কোম্পানী এবং প্রজাপক্ষ উভয়েই আপীল করিল। সাবজজ সাহেব কোম্পানীর আপীল ডিসমিস করিয়া প্রজাসাধারণে নীলচাষের জমিতেও গোচারণের অধিকার স্বীকার ডিক্রী দিলেন—কেবলমাত্র নীল ফসল থাকা

কালীন উক্ত জমিতে গোমিহিষাদি চরান চলিবে না এইরূপ আদেশ দিলেন। হাইকোর্টে কোম্পানী দ্বিতীয় দফায় আপীল করিলে হাইকোর্ট প্রজা সাধারণের অধিকার সম্পর্কে এবং তাহারা যে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছে যে বিষয়ে সাবজজের সহিত ভিন্ন মত পোষণ করিয়া উপোরোক্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা পুনর্বিচারের জন্য পাঠাইল। প্রজাসাধারণ তখন সম্রাটের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিল। প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের রায় বাতিল করিয়া দিয়া সাবজজের রায় বহাল রাখিল এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে খরচার ডিক্রী দিল। তবে প্রিভি কাউন্সিল এইরূপ একটি সর্ত্ত সংযোজন করিল যে বিবাদী কোম্পানী পক্ষ অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারীগণের পতিত জমি পুনরুদ্ধারের অথবা তাহার উন্নতি সাধনের অধিকার বজায় থাকিল কিন্তু বাদীগণের তথা প্রজাসাধারণের গোচারণভূমি যথেষ্ট রাখিয়া তবে পতিত জমি ঐভাবে কোম্পানী ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে। আরও নির্দ্দেশ রহিল যে এ বিষয়ে উভয় পক্ষে যখনই মতান্তর বা বিরোধ দেখা দিবে তখন সাব জজসাহেবের নিকট বিক্ষুব্ধ পক্ষ বিচার প্রার্থনা করিবে।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মচেতনার অভাবে অন্ধকারে আর্ত্তিত প্রজাসাধারণ এই অভাবিত জয়ে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিল এবং সুনিশ্চিতভাবে আত্মসচেতন হইল। এইভাবে একটি স্থানীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্থানীয় আন্দোলন এক বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিল। তাহাদের স্বপ্নের অগোচর এই বিপুল বিজয় শ্বেত উৎপীড়ক জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার শক্তি ও প্রেরণা যোগাইল এবং নেতাও সৃষ্টি করিল। শ্বেত উৎপীড়নের এই ক্ষুদ্র যুদ্ধের বিজয়োল্লাস তাহাদের স্বাধীনতার বৃহত্তর সংগ্রামে ব্রতী ও তৎপর করিল এবং জাতীয় কংগ্রেসের গড়বেতা শাখার উদ্বোধন হইল।

১৯০৭ সালের দুর্গাপূজা আসিল। তরুণের দল এই পূজা অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা সহকারে উদ্‌যাপিত করিল। তাহারা দেবীর অসুরদলনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সব কিছু পুরাতন ও জীর্ণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নূতন সৃষ্টির আকুতি জানাইল। তাহারা এই উপলক্ষে জনগণের নিকট আবেদন করিল এবং প্রশ্ন করিল কতদিন আর তাহারা এই জঘন্যতম পীড়ন নীরবে সহ্য করিবে এবং কেন করিবে? জনগণ কি ইঁটের বদলে পাটকেলটি মারিতে অক্ষম ইহাই হইল তাহাদের প্রশ্ন। পূজা উপলক্ষে যাহাতে ম্যানচেষ্টারে বিনির্ম্মিত বস্ত্র বিক্রীত না হয় সে জন্য

বাজারে সর্ব্বত্র পিকেটিং করা হইল। দলে দলে তরুণ ও বালকের দল রাস্তায় রাস্তায় পরিক্রমণ করিয়া বিলাতী বর্জ্জনে লোকমনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাহারা পণ্য বিক্রেতাদের গভীর অসন্তোষের কারণ হইল। উহাদের মধ্যে পিশুন প্রকৃতির ব্যক্তিরা পুলিসে সংবাদ দিল পুলিশও তৎক্ষণাৎ ঐ আবেদনে সাড়া দিয়া ছাত্রবৃন্দকে গ্রেপ্তারের ভীতি-প্রদর্শনে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। ইহাতে কয়েকজন স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বাঞ্ছা করিল। ফলে হতবুদ্ধি হইয়া কনেষ্টবলরা চলিয়া গেল। তাহার পর কোত্ওয়ালী থানার প্রধানতম সাব ইন্‌সপেক্টর, আর একজন সাব-ইন্‌সপেক্টর ও একজন জমাদার ও বহু কনেষ্টবলসহ স্ব স্ব পোষাকে সজ্জিত হইয়া অবতীর্ণ হইল এবং পথে পথে টহল দিয়া জনমনে তথা পিকেটারদের মনে ভীতি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিল। তাহারা বণিকদিগকেও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল ও তাহাদের মামলা করিতে প্ররোচনা দিতে লাগিল। একবার ছাত্রদের সহিত সঙ্ঘর্ষেরও সূচনা হইল কিন্তু উহা গুরুতর আকার ধারণ করে নাই। ক্রেতারা ছাত্রদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে বুঝিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গগন মুখরিত করিয়া তাহারা চলিয়া আসিল।

পূজার সময় একটি জাতীয় পতাকা প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হইল। স্বরাজ এখন আর নিরর্থক শব্দ মাত্র নহে বাঙালী উহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে প্রাণ আকর্ষণ করিল। দেশমাতৃকা তাহার নিকট অসুর ও সিংহ গর্জ্জনি জগজ্জনী দুর্গার প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিচিত হইল। দেশ জননীর প্রতিলিপি হস্তে জাতীয় পতাকা শোভিত হইল ও উহাতে দেবনাগরী হরফে স্বরাজ কথাটি লিখিত হইল। তাঁহার পশ্চাতে অগনিত পর্ব্বত শীর্ষের তরঙ্গ এবং সম্মুখে চৌধুরী, ওয়াচা, লাল, পাল' ব্যানার্জ্জি, উন্নত শীর্ষ শিখ এবং অন্যান্য স্বদেশী নেতাদের প্রতিলিপি অঙ্কিত হইল। মেদিনীপুরে হাফটোন ব্লকের এইরূপ ছবি শীতাবসানের জীর্ণ পত্রের মত. অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলন স্বাদেশিকতা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুপন্থী। স্বদেশের আদর্শ মানব হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী। কবি বলিয়াছেন—এই আমার দেশ। ইহাই আমার স্বদেশ উহা উচ্চারণ_ করে না এইরূপ মৃত ব্যক্তি জগতে থাকিলেও সে সঞ্জীবিত হউক।

১৯০৭ সালে ২রা অক্টোবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহম্মদ দিদার বক্স হেমচন্দ্র সেন সহ মেদিনীপুরে একটি সমাবেশে সভাপতিত্ব করিতে আসেন—ঐ সভায় পরবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলা কনফারেন্সের খুটিনাটি

আলোচিত হইবে। মেদিনীপুর ষ্টেশনে তাঁহাদের রাজা কালীপ্রসন্ন, যোগেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, নারায়ণ পাল, অবিনাশচন্দ্র মিত্র রাধাগোবিন্দ পাল, নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, নাড়াজোল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার, কুমুদচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীপতি রায়, উকিল যোগন্দ্রনাথ সেন, দেবদাস করণ প্রমুখ ব্যক্তি ও শত শত তরুণ স্বেচ্ছাসেবক কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত করিলেন—সকলকে স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কে বি দত্তের বাড়ীতে লইয়া গেল ও অনেক ফটো লওয়া হইল। একটি গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া তিনশত ছাত্র লাঠি ও পতাকা লইয়া নিজেরা টানিয়া সুরেন্দ্রনাথকে শোভাযাত্রা সহকারে ও বন্দেমাতারম ধ্বনি দিয়া বেলা হলে লইয়া গেল। ঐ হলে সমাবেশের তিলধারণেরও স্থান হইল না। এই সমাবেশে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং পরবর্তী ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরের জেলা সমাবেশ হইবে এইরূপ স্থির হইল। উক্ত সমাবেশে কে বি দত্ত সভাপতি, রঘুনাথ দাস অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান, ত্রৈলোক্যনাথ পাল ভাইস চেয়ারম্যান, পি কে বোস সেক্রেটারী, বি, এন শাসমল, নাগেশ্বরপ্রসাদ সিং, মতিলাল মুখার্জ্জি, মহেন্দ্রনাথ দাস এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, অবিনাশচন্দ্র মিত্র কোষাধ্যক্ষ এবং দেবদাস করণ সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ ওজস্বিনী ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাষণে সকলকে সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতে এবং স্বদেশী প্রচোরে ও বিলাতী বর্জ্জনে যত্নবান হইতে আহ্বান জানাইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ও দিদার বক্সও সুপটু ভাষণে স্বদেশী ও বিলাতী বর্জ্জনের অনুকুলে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। হেমচন্দ্র সেন জাতীয় সঙ্গীত গাহিলেন। যে বিভেদ ও বিসম্বাদ প্রকট হইয়াছিল তাহা সর্ব্বজনমান্য মহান নেতা সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে বিদূরিত হইল এবং সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় স্বার্থে কার্য্য করিতে সঙ্কল্প লইলেন। কিন্তু চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা তাহাদের নিজস্ব মূলনীতিতে আপোষ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজীর প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী বিভেদ এড়ান গেল। কিন্তু কতদিনের জন্য? উভয় মতাবলম্বীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। সুরাট কংগ্রেসের পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইল এবং উভয় পক্ষই চরম সঙ্ঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মেদিনীপুরের জেলা রাজনৈতিক সমাবেশে কলিকাতার নরমপন্থীগণ যথা কৃষ্ণকুমার মিত্র, জে. চৌধুরী, গিসাপতি কাব্যতীর্থ প্রমুখ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এবং চরমপন্থীগণ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ললিতমোহন ঘোষাল প্রমুখ

অরবিন্দের নেতৃত্বে আসিয়া যোগদান করিলেন। মেদিনীপুরে আসিয়া স্থানীয় প্রথিত যশা ও বারের নেতা একজন নরমপন্থী সভাপতির দ্বারা চরমপন্থীগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইল না। চরমপন্থীরা এই পূর্ব্ব স্থিরীকৃত সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল এবং তাহারা ইহাতে স্বাধিকারের দাবী করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা এই পরিমার্জ্জিত স্বভাবের ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত কেবলমাত্র ইংরাজীতে বক্তৃতা দানে সক্ষম ভদ্রলোকটিকে সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইল। প্রারম্ভেই অভ্যর্থনা সমিতির সমাবেশেও চরমপন্থীরা বারে বারে দাবী করিতে লাগিল যে যাবতীয় কার্য্যাবলী প্রস্তাবাদিও সর্ব্বপ্রকার লিপি মাতৃভাষাতেই অনুলিখিত হউক—কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। সত্যেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকদের মুখ্য নির্ব্বাচিত হন। অভ্যর্থনা সমিতি প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী রচনা করিল।

(১) এই সভা ঘোষণা করিতেছে যে স্বরাজ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জ্জনই ইহার লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে স্বাবলম্বনই একমাত্র পন্থা।

(২) জাতীয় উন্নয়ন জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নহে সেইজন্য এই সভা সিদ্ধান্ত করিতেছে যে বালক বালিকাদের জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিবার জন্য জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য।

(৩) দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা সিদ্ধান্ত করিতেছে যে জেলার প্রতিটি গ্রামে ব্যায়াম কেন্দ্র ও আরক্ষা সমিতি গঠন করা একান্ত-ভাবে আবশ্যক। ইহার দ্বারা স্বাস্থ্য গঠনে আত্মরক্ষায় সাহায্য হইবে।

এই সভা পুনরায় শপথ লইতেছে যে স্বদেশী ও বিদেশী বর্জ্জন আবশ্যক এবং এই শপথ রক্ষায় সামাজিক অনুশাসন অত্যাবশ্যক।

(৫) মামলা মোকর্দ্দমা আমাদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করে বলিয়া এবং জনগণের ধন সম্পদ ক্ষয়কারী বলিয়া এই সভা সিদ্ধান্ত করে যে আমদের যা কিছু বাদ বিসম্বাদ পঞ্চায়েৎ বিচারে নিষ্পত্তি করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

(৬) অনটনের প্রতিকার কল্পে সারা জেলায় ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠা করিয়া শস্য সঞ্চয় করা আশু কর্ত্তব্য ইহাই এই সভার সুচিন্তিত মত।

(৭) অর্থ সংগ্রহ অত্যাবশ্যক বিধায় এতদুদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করা হউক এবং দিকে দিকে জেলার জনপদবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক

ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ বিতরণ ও প্রচারের জন্য প্রচারক নিযুক্ত করা হউক।

(৮) জেলার জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে স্বাস্থ্যোন্নয়নে জাতীয় সমৃদ্ধিকল্পে মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাসোশিয়েশন নামে এক একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্টিত হউক।

যদিও অভ্যর্থনা সমিতির প্রস্তাবাবলী বাঙলায় রচনা করার দাবী অগ্রাহ্য করা হয় এবং সভাপতি তাহার বাঙলা ভাষার জ্ঞান কম বলিয়া ইংরাজীতে ভাষণ দিতে চাহিলেও চরমপন্থীরা বারংবার বাঙলায় ভাষণ দিবার দাবী জানাইতে লাগিল। তিনি এবং সুরেন্দ্র নাথ একটি পত্র পাইলেন এবং পঞ্চাশ জনের একটি ডেপুটেশন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দাবী জানাইল যে সভাপতি তাঁহার ভাষণ বাঙলায় দিন এবং তিনি খদ্দর ধুতি পরিধান করুন ও তাঁহাকে স্বরাজ ও বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধেও ভাষণ দিতে হইবে। কে, বি দত্ত তাঁহাদের বলিলেন যে তিনি ভাল বাঙলা বলিতে পারেন না এবং সেইজন্য তঁহার ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করা যাইতে পারে—কিন্তু এই পদ্ধতি চরমপন্থীদের ও তাহাদের অনুগামী স্থানীয় বহু সমর্থকের বিশেষ মনঃপুত হইল না। ৭ই প্রভাতে সুরেন্দ্রনাথ অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দরকে পত্র লিখিয়া মতানৈক্য মীমাংসা করিয়া লইতে আহ্বান জানাইলেন। অরবিন্দ লিখিলেন যে তিনি খুব ব্যস্ত আছেন—সেইজন্য যদি সুরেন্দ্রনাথের সময় হয় তাহা হইলে তিনি বেলা বারটায় সাক্ষাৎ করিতে পারেন। এই সময় শ্যামসুন্দর তাঁহার সুহৃদ সহযোগে এবং কিছু ডেলিগেটের সমভিব্যাহারে বদ্ধ দুয়ার ঘরে সভা করিতে তৎপর ছিলেন এবং দু জন স্বেচ্ছাসেবক এই গোপন সভার কক্ষপথ সমুহ পাহারা দিতে ছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র দৈবক্রমে এইখানে উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহাকে বহিরাগত বিবেচনায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল না। ত্রৈলোক্যনাথ পালের সঙ্গতবাজার বাসগৃহে এই সভার কার্য্য চলিতেছিল। তিনি বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণকুমারের সহিত মাত্র কয়েকটি সৌজন্যমূলক কথাবার্ত্তা বলিলেন। অরবিন্দ সুরেন্দ্রনাথের সহিত আদৌ সাক্ষাৎ করিলেন না। ডেলিগেটদের তাঁহার সহিত মতবিনিময় করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করিলেন। অনেকেই আসিলেন এবং দেখা গেল যে নির্দ্ধারিত প্রস্তাবাবলীতে কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু কয়েকজন সভাপতির ইউরোপীয় পরিচ্ছদেও তৎকর্ত্তৃক ইংরাজীতে ভাষণদানে আপত্তি জানাইল। সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

বলিলেন যে ঐ ভাষণ সর্ব্বভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে তাই উহা ইংরাজীতেই দিতে হইবে। কিন্তু উহার বাঙলা অনুবাদ টেবিলে প্রস্তুত এবং তাহাও পঠিত হইবে। সভানুষ্ঠানের পূর্ব্বে আবার বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহাদের বিরোধীয় বিষয় দেখা গেল অনেক এবং কতগুলি বেশ জটিল। চরম পন্থীগণ ডেলিগেটদের রাহা খরচা গ্রহণে আপত্তি জানাইল। তাহারা নরমপন্থীদের কৌশলপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা সমিতির গঠনে আপত্তি জানাইল এমনকি সভাপতি সম্পর্কেও প্রতিবাদ জানাইতে কুণ্ঠিত হইল না। যদিও সভাপতি ভিন্নমত পোষণ করিতে লাগিলেন তথাপি তাঁহারা সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তনীয় রাখিবার দাবী জানাইল। সংবাদপত্রে বহুল প্রচারিত প্রসিদ্ধ আখড়া সমূহ সম্পর্কেও একটি প্রস্তাব ছিল। উক্ত প্রস্তাব এইরূপ ছিল দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আখড়াগুলিকে দেশের আরক্ষণ-সংস্থাগুলির সহিত সংযোজনা করা হউক। নরমপন্থীরা ইহাতে এই বলিয়া আপত্তি জানাইল যে যদি আখড়াগুলিকে বিশুদ্ধ ব্যায়াম কেন্দ্ররূপে না রাখিয়া পুলিশের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা হইলে সরকার হয়ত ক্রুদ্ধ হইবে। অতএব এই প্রস্তাব হইতেও কিছু কিছু বাদ দেওয়া হইল। ইহার পর স্বরাজ প্রস্তাব লইয়াও মতানৈক্য সুরু হইল। চরমপন্থীরা স্বরাজ বলিতে পূর্ণ স্বাধীনতাই বলিতে চান আর নরমপন্থীরা স্বরাজ বলিতে উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বুঝিতে চান।

১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর বেলা তিনটায় মল্লিকের চকে একটি বিশেষ সজ্জিত মণ্ডপে উপরিউক্ত অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে সভা আরম্ভ হইল। প্রায় দুইশত ডেলিগেট এবং চারিহাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু নীরব ছিল না—তাঁহারা সমস্ত বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়াছিল। ডেলিগেটদের ও দর্শকদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল যাহাতে কেহ লাঠি লইয়া যাইতে না পারে। পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট স্বয়ং বিশাল পুলিশ বাহিনীসহ উপস্থিত ছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্য বিধি আইনের ১৪৪ ধারা বলে সর্ব্বপ্রকার শোভাযাত্রা নিষেধ করিলেন কিন্তু ইহাও জানান হইল যে আবেদন করিলে শোভাযাত্রার ছাড়পত্র মিলিতে পারে।

নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রী কে, বি, দত্ত সভায় শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার তিনশত স্বেচ্ছাসেবক সহ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহ সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। কলিকাতার হেমচন্দ্র সেন বন্দেমাতরম সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন করিলেন এবং সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান

হইয়া জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা জানাইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রঘুনাথ দাস ইংরাজীতে একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিয়া ডেলিগেটদের স্বাগত জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা বাঙলায় অনুবাদ করা হইল। ক্যাঁচকাপুরের বিহারীলাল সিংহ সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য কে, বি, দত্তর নাম প্রস্তাব করিলেন এবং তমলুকের যোগেন্দ্রনাথ সিংহ উহা সমর্থন করিলেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণ দিতে উঠিলেই চরমপন্থীরা তাঁহাকে বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলেন যে তাঁহার ভাষণে স্বরাজের উল্লেখ আছে কিনা। ফলে একটি উষ্ণ বিতর্কের সুচনা হইল। ভাষণ দিবার পূর্ব্বে সভাপতিকে তাঁহার ভাষণের বিষয় প্রকাশ করিতে বলা কংগ্রেসের তথা যে কোনো সভার রীতিবিরুদ্ধ ও অভাবিত বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন। এমন একটা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইল যে উভয় দলের প্রধান গণের ব্যগ্র প্রচেষ্টাতেও উহার নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে পুলিশ ডাকা হইল এবং পি, কে, বোস পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্টকে সঙ্গে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহাকে সভাপতির পার্শ্বেই উপবিষ্ট করাইলেন। নিয়মভঙ্গকারী চরম পন্থী-দের উদ্দেশ্যে সরবে ঘোষণা করিলেন যে তিনি নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন আইনের সাহায্যে। ধ্বনি ও পাল্টা ধ্বনির মধ্যে সভাপতি তাঁহার ভাষণ দিতে থাকিলেন। মেদিনীপুর সহরের পনের জন, দাঁতনের দুইজন, গড়বেতার তিনজন, ঘাটালের দশজন, তমলুকের দশজন, এবং কাঁথির দশজন লইয়া বিষয় নির্দ্ধারণী উপসমিতি গঠিত হইল। পরদিন প্রভাতে যখন সভার কার্য্য সুরু হইল তখন দেখা গেল যে চরম পন্থীরা সকলেই অনুপস্থিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন, স্বদেশী প্রচার এবং বিদেশী সামগ্রী বর্জ্জনের প্রস্তাবাদি গৃহীত হইল।

প্রথমদিনের সভার পর চরমপন্থীরা ত্রৈলোক্যনাথ পালের গৃহে এবং পরদিন সকালে ও সন্ধ্যায় চন্দ্রাকরের মাঠে সমবেত হইলেন। এই সব সভায় মৌলভী আবদুল হক সভাপতিত্ব করিলেন। কলিকাতা হইতে অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, ললিতমোহন ঘোষাল, প্রমুখ এবং শীতল প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর নন্দ, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও বহুলোক এই সভায় যোগ দেন।

মেদিনীপুরে এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা পরিশেষে সুরাট কংগ্রেসে চূড়ান্ত-ভাবে কংগ্রেসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। ১৯০৮ সালের এপ্রিলে এলাহাবাদে নরম পন্থীদের আহূত এক জাতীয় সমাবেশে ভারতের জাতীয়

কংগ্রেসের একটি গঠনতন্ত্র এবং উহার শপথ বাণী রচিত হইল। এই সঙ্কল্প বাণীর মধ্যে ছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ হইতেছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত সংস্থার সম পর্য্যায়ে ও সমানাধিকারে ভারতীয় জনগণ কর্ত্তৃক স্বায়ত্ত শাসন অর্জ্জন ও সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া অনুরূপ অধিকার ভোগ ও সমপরিমাণ দায়িত্ব বহন।" এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে গঠনতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা এবং জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করিয়া জনমনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া, দেশের নৈতিক, সাংস্কৃতিক অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন ও শিল্পোন্নতি সাধন করিয়া তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দ্রুত সংস্কার সাধন দ্বারা।

চরমপন্থী দলের মধ্যেও ঘটনার দ্রুত রূপায়ণ হইতে থাকিল। প্রকাশ্য-ভাবে তাহারা নরম পন্থীদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিল এবং গোপনে বাঙলা দেশে বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইল। ১৯০৬ সালের শরৎকালে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ফটোগ্রাফীর উন্নত কলা-কৌশল শিক্ষার জন্য প্যারিস যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে এবিষয়ে মেদিনীপুরের জমিদার সংস্থা এবং বিশেষ করিয়া অবিনাশ চন্দ্র মিত্র সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা। তিনি হেমচন্দ্র দাস নামে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া কলম্বো হইতে মার্সেলিস পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। ইউরোপ যাত্রাপথে তিনি ১১ই সেপ্টেম্বর কলম্বো পৌঁছাইলেন। ১৯০৭ এর শেষ ভাগে অথবা ১৯০৮ সালের প্রারম্ভে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিপ্লবী দলের অন্যতম প্রধান রূপে বৃত হইলেন। তিনিই বিপ্লবী সংস্থার প্রয়োজনীয় বোমা প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার নির্ম্মিত বোমার দ্বারাই মজঃফরপুরের কর্ম্মযজ্ঞে ক্ষুদিরামকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত বিপ্লবী ডি ভি সাভারকর ১৯৩৫ সালের বঙ্কিম শতবার্ষিকীতে বলেন যে "গত সপ্তাহে অনেক জায়গায় জাতীয় সঙ্গীতের উদগাতা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এই সভায় জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সমীচীন যে জাতীয় পতাকাও হেমচন্দ্র দাস নামে অপর একজন বাঙালী বিপ্লবী ও দেশ প্রেমিকের দ্বারাই পরিকল্পিত অঙ্কিত ও বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন এবং প্রায় আমি যে সময় মুক্ত হই সেই ১৯২৪ সালেই মুক্তি পান। তিনি বলেন কিভাবে তাঁহার নির্ম্মিত পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা জার্ম্মানীর ষ্টুটগার্টে আগষ্টের ১৯০৭ সালে ম্যাডাম কামা কর্ত্তৃক উত্তোলিত হয়। ইয়াটাতে

প্যারিসস্থিত ভারতীয় বিপ্লবী সমাবেশে কিভাবে জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা হইবে সে বিষয়ে আলোচনা হয় ও স্থির হয় এবং মধ্যে বন্দেমাতরম্ মুদ্রিত জাতীয় পতাকার রূপ পরিকল্পিত হয়। ঐ সমাবেশে নির্দ্ধারিত পরিকল্পনানু-যায়ী হেমচন্দ্র ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা প্রস্তুত করেন।

আলিপুর বোমার মামলায় উক্ত হয়—"এই ষড়যন্ত্র অত্যন্ত গুরুতর ও ব্যাপক। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য বলপূর্ব্বক ব্রিটিশ ভারত হইতে রাজার অধিকার নাশ করা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে ইংরাজের বিরুদ্ধে সাধারণের মনে উত্তেজনা ও ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য যুগান্তর এবং অন্যান্য সংবাদপত্রকে নিযুক্ত করা হয় এবং পাঠক সাধারণের মনে ইংরাজ নিন্দা ও ইংরাজের প্রতি ঘৃণা প্রচার করা হয় এবং তাহাদের কাছে আবেদন করা হয় ইংরাজ শাসন উচ্ছেদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে। এই ষড়যন্ত্রের নায়কদের শিক্ষায় তরুণ সমাজ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে নরহত্যা করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয় এবং অতি বিস্ফোরক বোমা প্রস্তুত করা হয়।"

কর্ত্তৃপক্ষের গৃহীত দমননীতি অনুসারে সুশীল সেন ধৃত ও প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড কর্ত্তৃক ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহাকে প্রকাশ্যে বেত্রাহত করা হয়। এই ঘটনায় সারা দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিপ্লবীরা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইল। এইভাবে যাহাকে সাম্রাজ্যবাদীরা সন্ত্রাসবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল সেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম হইল। বাক্যের স্বাধীনতা যখন অপহৃত এই কার্য্য-করী পন্থাই তখন তাহার বিকল্প বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই অভিনব পন্থায় তরুণ সমাজ তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য নরহত্যা অপেক্ষা আত্মাহুতির উদ্দেশ্যেই অধিকতরভাবে আগ্রহী হইয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে এইভাবে দেশ মাতৃকার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়া দেশের তরুণ সমাজের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় তরুণের দল ইংরাজের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। ১৯০৭ সালের ৫ই নভেম্বর নারায়ণ গড়ের নিকট কটক হইতে প্রত্যাগত দলবল সহ স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের রেলগাড়ী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। ট্রেনটি সরাসরি খড়্গপুর যাইতেছিল এবং নারায়ণগড় ও বেনাপুরের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে চালক অনুভব করিল যে গাড়ীটি হঠাৎ একটু উঠিয়া পড়িল এবং লাফাইয়া উঠিল ও অবশেষে একটি উচ্চ বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হইল। নির্দ্ধারিত

সময়ে খড়্গপুরে পৌঁছাইবার জন্য চালক দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাইয়াছিল সেইজন্য এবং ইঞ্জিনটির উৎকর্ষ ও ওজনের জন্য (কারণ এটি নবতম মডেলের ছিল) গাড়ীটি লাইনচ্যুত হইল না। ভ্যাকুয়াম পাইপ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অথবা চালক ব্রেক কষায় ঠিক না জানা গেলেও ঘটনা স্থান হইতে অদূরেই গাড়ীটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ট্রেন দাঁড়াইতেই লেফটেনণ্ট গভর্ণর ও তাঁহার সহগামীদের অবস্থা জানিবার জন্য এবং দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য জনতা হইয়াছিল। স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার তাঁহার পত্নী ও পুত্র তাঁহার পরিচারকবৃন্দ, এ, ডি, সি গণ এবং রেলওয়ে ও পুলিশ কর্ম্মচারীগণ নিরাপদে আছেন। তবে ইহাও দেখ গেল যে একটি লাইন উপর দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে এবং তাহার নিম্নে মাটিতে একটি ৫ ফুট × ৩½ ফুট গর্ত্ত রহিয়াছে। স্লিপার চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুর্ঘটনার স্থানটি হাওড়া হইতে চুরাশী মাইল। নারায়ণ গড় হইতে দুই মাইল এবং খড়্গপুর হইতে বার মাইল। বিপ্লবীদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া কেহই সন্দেহ করিল না। কিন্তু এই কার্য্যের জনক কে সে বিষয়ে বহু জল্পনা কল্পনা করা হইয়াছিল এবং বহু মতামত প্রদত্ত হইয়াছিল। এই লাইনে অনতিপূর্ব্বে ধর্ম্মঘটকারী রেলকর্ম্মচারীদের মধ্যে কোনো কোনো বেপরোয়া ব্যক্তি এই কার্য্যের জন্য দায়ী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু ঐ গোলোযোগ অনেক পূর্ব্বেই সন্তোষজনকভাবে মিটিয়া গিয়াছিল বলিয়া এই অনুমান অগ্রাহ্য হইল। অপর একটি অনুমানে স্থির করা হইল যে মেদিনীপুর হইতে অকুস্থল যখন বেশীদূরে নয় তখন নিশ্চয়ই উহা মেদিনীপুরের কোনো কোনো বিক্ষুব্ধ বাঙালীর কীর্তি হইবে যাহারা রেলবর্ত্তে বিস্ফোরক স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ কার্য্যের জন্য লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের গতিবিধি ও রেলওয়ের কার্য্য প্রণালী ও সময় ইত্যাদি সম্পর্কে বহু তথ্যের আবশ্যক বলিয়া এ'রূপ কোনো ব্যক্তির দ্বারা ইহা সম্ভবপর বিবেচিত হইল না। অপর একটি ধারণা বলে এইরূপ স্থির হইল যে একজন পদচ্যুত স্থায়ী ওয়েমেন তাহার ইনসপেক্টরকে বিপাকে ফেলিবার জন্য স্লিপারে কুপ খননের জন্য ব্যবহৃত ডিনামাইট কার্টরিজ রাখিয়া এইরূপ অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পুলিশ তদন্ত চালাইয়া নয় জনকে গ্রেপ্তার করিল— সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিরা প্রধানত রেলের কুলী। তদন্তের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিঃ ওয়েষ্টন সি, আই, ডি, রামসদয় মুখার্জ্জিকে ও মৌলভি মাজহারুল হক, লালমোহন গুহকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা ধৃত কুলীগণের

নিকট হইতে "স্বীকারোক্তি"ও বাহির করিলেন। তাহারা বিবৃতি দিল যে তাহারা প্রত্যেকে পাঁচটাকা করিয়া অর্থের বিনিময়ে একজন বাঙালী ভদ্রলোকের প্ররোচনায় রেলওয়ে লাইনের নীচে একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে বন্দুকের বারুদ রাখিয়া দিয়াছিল ট্রেনটি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে। অর্থ সামান্য হইলেও তাহাদের দারিদ্র বশতঃ উক্ত টাকা তাহাদের কাছে খুব লোভনীয় মনে হইয়াছিল। দুজন এ্যাসেসরের সহায়তায় মেদিনীপুর সেসন জজ সাহেবের এজলাসে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনের বিচার হইল। শিবুদাস স্বীকারোক্তি করিয়া রাজ সাক্ষী হইল এবং মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইল। দায়রা জজ সাহেব নেপাল দোলই, অপি দোলই, কুমেদবারিক, তারা দেশাই, ও ফকির দাসকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং নেপালকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, অপি ও কুমেদকে সাত বৎসর করিয়া এবং তারা ও ফকিরকে পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তাহারা দণ্ডভোগ করিতে লাগিল এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারগণ সাফল্যের সহিত এই ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া "দোষীর" দণ্ডবিধান করানর পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের পদোন্নতি হইল। এমন সময় আলিপুর বোমার মামলার বারীন্দ্র কুমার ঘোষ একটি স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করিলেন যে ঐ ঘটনার জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণই দায়ী। বারীন বলিলেন যে উল্লাসকর দত্ত মাইনটি তৈয়ারী করেন এবং পলিতা ও ফিউজ পিকরিক এ্যাসিড ও ক্লোরেট অফ পটাশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হয়। ১৯০৭ সালের ৫ই নভেম্বর বিভূতি ও প্রফুল্লকে রাত্রিবেলা পাহারায় রাখিয়া তিনি নিজে ঐ মাইন পাতেন তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নারায়ণ গড় বোমার মামলার নথীপত্র তলব করিলেন ও সমস্ত বন্দীকে মুক্তির নির্দ্দেশ দিলেন।

আলিপুর বোমার মামলায় নারায়ণগড় বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত বারীনের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ ছিল :—

আমি, প্রফুল্লচাকী ও বিভূতিভূষণ সরকার সকালের গাড়ীতে খড়্গপুরে অবতরণ করি। বৈকালে আমরা একটি ট্রেনে চাপিয়া নারায়ণগড়ে নামি। আমরা রেল লাইনের সমান্তরাল পাকা রাস্তায় অপেক্ষা করি। অন্ধকার নামিয়া আসিলে আমরা রেলওয়ে লাইনে গেলাম ও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নারায়ণগড় হইতে খড়্গপুরের দিকে নয় মাইল দূরে বোমাটি পাতিতে সক্ষম হই। নিরপরাধ ব্যক্তি এই ঘটনায় দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া এতৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি বিশদ বিবরণ দিতে ইচ্ছুক।

আমাদের সঙ্গে একটি পুরু লৌহাবরণে ছয় পাউণ্ড ওজনের ডিনামাইট দ্বারা প্রস্তুত মাইন ছিল—ইহার উপরে একটি আবরণ ও মাঝখানে একটি ছিদ্র ছিল। আমাদের সঙ্গে ফিউজ ও নিশ্চয়ই ছিল এবং একটি কাগজের নলের মধ্যে আমাদের পিকরিক মিশ্রিত সামগ্রীও ছিল। ইহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা উহাতে সীসার নল বসাইয়া দিই। মাইনটি বসাইবার কালে দেখা গেল যে পাইপটি খুব বেশী বড় তখন আমরা উহাকে কাটিয়া ছোট করিলাম এবং টুকরাটি সেইখানে ফেলিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে একটি মোমবাতি ও একটি কাল রং-এর লণ্ঠন ছিল। কাগজে জড়ান অবস্থায় আমাদের সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ ছিল এবং ইংলিশম্যান ও বন্দেমাতরম পত্রিকাগুলির এক একটি সংখ্যা ছিল। এগুলিও ফেলিয়া আসা হয়। পিকরিক এ্যাসিড ও কাগজে মুড়িয়া ফেলা হয়। আমাদের সঙ্গে একটি কার্ড বাঁধান বাক্সও ছিল এবং কার্ডবোর্ডের বাক্সে তুলার উপর ফিউজটি ছিল। সেটিও ফেলিয়া আসা হয়। তুলাও ফেলিয়া আসা হয়। আমরা লাইনের নীচে একটি ঝোপের পাশে বসিয়া মিষ্টান্ন খাই। সেখানে পাতা ও ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য পড়িয়া থাকে। আমারা রাত্রি ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে মাইনটি পাতি। আমি একাকী হাঁটিয়া নারায়ণগড়ে যাই এবং কলিকাতাগামী শেষ ট্রেনটি ধরি। ঐ দুটি বালক সেখানে থাকিয়া যায় এবং স্পেসাল ট্রেনটি আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া তাহারা ফিউজটি লাগাইয়া দেয়। যখন বিস্ফোরণ হয় তখন বালক দুটি প্রায় দেড় মাইল দূরে ছিল। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লিখুন যে আমরা কুলী কিম্বা অপর কোনো লোকেরই কোনোরকম সাহায্য লই নাই।”

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টায় একটি যুগান্তকারী বহু সম্ভাবনাময় ও আশাপ্রদ বৎসর। এতদিন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। অরবিন্দের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা প্রকাশ্য স্থানে সুশীল সেনকে বেত্রাঘাত আদেশ দেওয়ার অপরাধে কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মজঃফরপুরে একটি প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণ শ্রুত হইল, মিসেস ওমিস কেনেডির গাড়ীর উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং মিসেস ওমিস কেনেডি ও সহিস গুরুতররূপে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জেলাজজ কিংসফোর্ড সাহেবের ফটকের সন্নিকটেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এই বোমা কিংসফোর্ডের উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হয়। কিংসফোর্ডের গাড়ী ও তাহাদের প্রায় একই আকারের ও রঙের ছিল বলিয়া এবং কিংসফোর্ডের

গাড়ীটিও কেনেডির গাড়ীর পশ্চাতে ক্লাব গৃহ হইতে বাহির হয়—এই কারণে ভুল হইয়া যায়। নারায়ণগড়ে যে উপকরণ দিয়া বোমা বিনির্মিত হইয়াছিল এখানেও সেই একটি প্রকার বোমা ব্যবহৃত হয়। কিংসফোর্ডকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে দুটি বালক কলিকাতা হইতে অনুরূপ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে।

ক্ষুদিরাম

বোমা নিক্ষেপকারী ক্ষুদিরাম ওয়ানি রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হয়। সে তখন মাত্র ১৮ বৎসর বয়স্ক বালক। ৫ই মে তারিখে ডি, এস, পি, তাহাকে মজঃফরপুরে আনয়ন করেন। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে বাহির হইয়া ভাবনা চিন্তাশূন্য উৎফুল্ল বালকের মত বাহিরে রক্ষিত একটি ফিটন গাড়ীতে আরোহণ করিল। ডি. এস. পি. এবং অপর একটি পুলিশ অফিসারের মধ্যে তাহাকে বসান হইল। আসন গ্রহণ করিয়া বালক আবেগময়কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনি. করিল। পরদিন আদালতে সে একটি বিবৃতি দিল এইভাবে যে তাহার নাম ক্ষুদিরাম বসু, সে মেদিনীপুরের ছেলে এবং এণ্ট্রান্স ক্লাশের ছাত্র, সে ভারতের ঘৃণ্যতম অত্যাচারী মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিল। সে আরও বলিল যে উহার বদলে দুইটি নির্দোষ নারী নিহত হওয়ায় সে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সে বলিতে লাগিল যে সে সোজা মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছে এবং হাওড়ায় তাহার সহযোগী দীনেশের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, ক্ষুদিরাম তখনও জানিতে পারে নাই যে তাহার সহযোগী ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে, এবং দীনেশ বোমা তৈয়ারির প্রণালী জানে। ক্ষুদিরামের কাছে দুইটি রিভলভার ও কার্টিজ ছিল—এইগুলি সে কলিকাতায় খরিদ করে তাহারা সাত আট দিন পূর্বে মজঃফরপুরে আসে এবং একটি ধর্মশালায় থাকে—তাহারা কিশোরীবাবু নামে একটি বাঙালী ভদ্রলোককে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করে তাহার অফিস ধর্মশালার নিকটেই। লোকের কাছে তাহারা পরিচয় দেয় যে তাহারা ঐ বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচিত। তাহারা কিংসফোর্ডের খোঁজ তল্লাস করিয়া জানিতে পারে যে তিনি কখনই তাঁহার বাংলোর কয়েক গজ দূরে অবস্থিত ক্লাবঘর ব্যতীত অন্য কোথাও যান না। তাহারা কিংসফোর্ডকে হত্যার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। তাঁহার একদিন দায়রা বিচার করা অবস্থায় আদালতে কিংসফোর্ডকে

দেখে এবং একবার মনে করিয়াছিল যে সেইখানেই তাহার দিকে বোমা নিক্ষেপ করিবে—কিন্তু অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইবে বিবেচনায় সে অভিলাষ ত্যাগ করে। পরে ৩০শে এপ্রিল ক্লাব হইতে কিংসফোর্ডের গাড়ী আসিতেছে লক্ষ্য করে এবং উক্ত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং বোমা নিক্ষেপ করে। তাহারা আগেই জুতা খুলিয়া রাখিয়াছিল—উভয়ে বিভিন্নদিকে ছুটিয়া যায়—তাহার সহযোগী বাঁকিপুরের দিকে যায় এবং সে সমস্তিপুরের দিকে যায়। সেখানে ওয়ানিতে একটি মুদীর দোকানে জল খাইতে থাকাকালীন তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

ক্ষুদিরামের সহযোগী প্রফুল্ল চাকী সমস্তিপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যায়—এবং মোকামাঘাট অবধি ইণ্টার ক্লাশের একটি টিকিট ক্রয় করে। সেখানে সে নামে এবং সেখান হইতে হাওড়া অবধি আর একটি ইণ্টার ক্লাশ টিকিট খরিদ করে। একটি শাদাপোষাক পরিহিত কন্‌ষ্টেবল সমস্তিপুর হইতে তাহাকে সঙ্গোপনে অনুসরণ করে এবং তাহার আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় তাহার একটি হাতে ধরিয়া গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া প্ল্যাটফরমে নামিয়া পড়ে এবং মোকামাঘাটের পুলিশের অনুসরণের মধ্যে ছুটিতে থাকে। অবশেষে পলায়ন অসম্ভব দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিকটবর্তী কন্‌ষ্টেবলের উদ্দেশ্যে গুলী করে কিন্তু ঐ গুলী ব্যর্থ হয় এবং কনষ্টেবলের কাঁধ ছুঁইয়া চলিয়া যায়। কন্‌ষ্টেবলটি তাহার নিকটবর্তী হইতে লাগিল কিন্তু তখনও সামান্য অবসর আছে দেখিয়া সে পিস্তলের সাহায্যে নিজের দেহে দুইটি গুলী চালায়—একটি তাহার দাড়ির মধ্য দিয়া এবং অপরটি তাহার কাঁধের নিকটবর্তী হাড়ের (কলার বোনের) মধ্য দিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করে—প্রচুর রক্তপাতের ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ অস্ত্রটি ব্রাউনিং পিস্তল ছিল।

মজঃফরপুরের সেসন জজের এজলাসে ক্ষুদিরামের বিচার হয়। কৈলাসনাথ বসু সহ রংপুর হইতে তিনজন আইনজীবি তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। সে আদালতে বিবৃতি দেয় এই বলিয়া--"আমি মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা। আমার মাতা পিতা, মাতুল অথবা পিতৃব্য কেহ নাই। আমার কেবল এক দিদি আছে তাঁহার অনেকগুলি সন্তান। বড়টি প্রায় আমার বয়সী। মেদিনীপুরের জজ আদালতের হেড ক্লার্ক অমৃতলাল রায় আমার ভগ্নীপতি। আমার আত্মীয় বলিতে কেবল উহারাই। অবশ্য আমার একটি জেঠতুত ভাই আছেন—নাম অবিনাশচন্দ্র বসু কিন্তু তিনি আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

আমি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছি এবং দুই তিন বৎসর পূর্বে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি যখন হইতে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে সুরু করি, তখন আমার ভগ্নীপতি অমৃত আমায় পরিত্যাগ করেন। আমি একটিবার মেদিনীপুর ও আমার দিদি ও তাঁর ছেলেদের দেখতে ইচ্ছুক। তাহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়।

প্রঃ। তোমার কি মনে কোনো বিক্ষোভ আছে ?

উঃ। না, কিছুমাত্র নাই।

প্রঃ। তুমি কি তোমার আত্মীয় পরিজনদের কোনো সংবাদ দিতে চাও অথবা তাঁহারা আসিয়া তোমার সাহায্য করুন ইহা চাও ?

উঃ। না। আমি তাঁহাদের সহিত নিজ হইতে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাই না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন।

প্র ঃ কারাগারে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে ?

উঃ। বেশ ভালই। তবে যে খাদ্য আমায় দেওয়া হয় তাহা ভাল নয় এবং ফলে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। এ ছাড়া আমার প্রতি অন্য কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয় না। আমায় একটি নির্জন কারা কক্ষে দিবারাত্র আটক রাখা হয়। কেবলমাত্র দিনে একবার স্নান করিবার সময় আমায় বাহিরে আনা হয়। আমি একা একা থাকিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে সংবাদপত্র অথবা কোনো বই পড়িতে দেওয়া হয় না। আমি ঐ সব পড়িতে খুবই ভালবাসি।

প্রঃ। তুমি কি ভয় পাও নাই ?

উঃ। সে হাসিয়া উত্তর দিল, কিসের জন্য ভয় পাইব ?

প্রঃ। তুমি কি গীতা পড়িয়াছ ?

উঃ। হাঁ, আমি পড়িয়াছি।

ক্ষুদিরাম খুবই সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ শান্ত ব্যবহার দেখায়। কথা বলার সময় তাহাকে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ দেখা গিয়াছিল এবং ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন তাহার ললাটে ফুটিয়া উঠে নাই। ১৩ই জুন রায় বাহির হইল এবং ক্ষুদিরামকে আমৃত্যু ফাঁসিতে ঝুলাইবার আদেশ হইল। রায় ঘোষণা হইবার পর ক্ষুদিরাম বলে "উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট আমার কিছু বলিবার আছে।" জজসাহেব মন্তব্য করেন এখন এত বিলম্বে আমি কোনো কথা শুনিতে চাহি না।" ক্ষুদিরাম তখন বলিল যে, যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে সে বলিতে পারে কিভাবে বোমা তৈয়ারী হইয়াছিল। জজসাহেব তাহাকে

জেলে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। দীর্ঘ দিন বিচারকালীন মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে ক্ষুদিরামকে দুর্বল ও পাণ্ডুর দেখাইতেছিল কিন্তু আশ্চর্য তেজ ও বীর্য্যের পরিচয় মিলে তাহার দৃপ্ত ভঙ্গিমায়—বিচার চলাকালীন সকলেই তাহার অপূর্ব তেজপুঞ্জ লক্ষ্য করে। কখনও বা তাহাকে কাঠগড়ায় ঘুমাইতে দেখা যায়, কখনও বা তাহাকে গান করিতে কখনও বা কাঠগড়ায় বাজনা বাজাইতে দেখা যায়। রায়ের দিন কখনও কখনও ক্ষুদিরাম আগ্রহ সহকারে আদালতের কার্য্যবিবরণী শুনিতেছিল, কখনও বা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িতেছিল। যখন জজ আবেগ সহকারে এ্যাসেসরদের চার্জ বুঝাইতেছিলেন তখন ক্ষুদিরাম হাসিতেছিল। রায়দানের পরে জজসাহেব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে রায় বুঝিয়াছে কিনা—জবাবে ক্ষুদিরাম হাসিয়া মাথা নাড়াইল। তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং শান্ত ধীর চিত্তে তাহার রায় গ্রহণ করিয়া বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আদালত কক্ষ মুখরিত করিয়া দিল! হাইকোর্ট ক্ষুদিরামের তরফ হইতে মৃত্যুদণ্ড মকুবের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ড মঞ্জুর করিল। তখনও ক্ষুদিরামের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না—বরং দৃঢ় সঙ্কল্প ও আত্মপ্রত্যয়ে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন সে গীতা পড়িতেছিল।

মজঃফরপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট ভোর ছটায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হইল। শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাহাকে কারাকক্ষ হইতে লইয়া আসা হইল। বধ্য মঞ্চে লইবার পূর্বে তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইল। সমস্ত পথটি দৃঢ় ও দ্রুতপদক্ষেপে সে আসিয়াছিল এবং তাহার মুখমণ্ডল পুলকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। একটি কথা না বলিয়া বীরের মর্য্যাদার সহিত সে ফাঁসীমঞ্চে স্বয়ং আরোহণ করিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার পর ফাঁসীর দড়ি তাহার কণ্ঠে বিজয়মাল্যের মত সুশোভিত হইল। জেল সুপারিনটেনডেণ্ট মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন—তাহার পর নিশানা দেওয়া হইল এবং ভারতের নব পর্য্যায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া গেল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের বড় কর্তা এবং ডি. এস. পি এবং সামরিক পুলিশ এই নিধন যজ্ঞ শালায় উপস্থিত ছিল। দর্শকদের মধ্যে দুইজন ইউরোপবাসী, দুইজন বাঙ্গালী দুইজন বেহারী উপস্থিত ছিলেন। জেলের প্রবেশ পথ পুলিশ প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং কাহাকেও কারা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বেলা আট ঘটিকার সময় শববাহীদের ডাকা হইল। কারাগারের সীমার

মধ্যে শববাহী খাটিয়া দুইজন বন্দী বহন করিয়া উকিল কৈলাসনাথ বসু ও অসংখ্য শোকাচ্ছন্ন দেশবাসীর নিকট দেওয়া হইল। শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার রাস্তার দুইপার্শ্বে অসংখ্য পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। দুইজন কনষ্টেবল অগ্রে অগ্রগামী হইয়া জনস্রোত পরিষ্কার করিতে লাগিল। ডি. এস. পি. ইনসপেক্টর এবং ১২ জন কনষ্টেবল শ্মশান ঘাট পর্যন্ত উহাদের অনুগামী হইল। শহীদের নশ্বর দেহে পূতাগ্নির সংযোগ হইলে তাহারা চলিয়া গেল। কোত্‌ওয়ালী থানার সহকারী ইন্‌সপেক্টর চিতাগ্নি পরি-নির্বাপিত হওয়া পর্যন্ত ছিল। গণ্ডক নদীর তটে যথা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদানকারী স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রথম আহুতি শহীদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সহস্র সহস্র দেশবাসী শ্মশান ঘাটে, রাস্তায় এবং অলিতে গলিতে ভীড় করিয়াছিল। ক্ষুদিরামের উকিল ফাঁসীর ২।৩ দিন পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে বলিয়াছিল যে অতীতে রাজপুত রমণী যেভাবে হাসিতে হাসিতে জহরাগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিত সেও সেইভাবে অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভয়শূন্যভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে। এইভাবে মাতৃপূজার বেদীতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে মহান মর্য্যাদায় মৃত্যু বরণ করিয়া লইল।

দলচ্যুতের শূন্যস্থান পূর্ণ কর
শক্তি দাও হে দুর্বল চিত্তে
অবারিত হোক চলার পথ
জগতসীমার শেষ পারে
ঐশী কৃপায় তাঁহার ধামে।

মেদিনীপুর তথা ভারতবাসীর নিকট মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ক্ষুদিরাম মরিয়া অমর হইল। ক্ষুদিরামের অমর কথা ঘরে ঘরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে গীত হইতে লাগিল এবং কিঞ্চিৎ ন্যূন পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপিয়া স্বাধীনতাযুদ্ধের সৈনিকেরা ঐ মৃতসঞ্জীবনী গানে অমৃতত্বের উপাসনা করিয়াছে, অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহামরণের দ্বারে অমরত্ব অর্জন করিয়াছে। বিপ্লব প্রচেষ্টায় ক্ষুদিরামের উত্তর সুরীগণ তাহার বীরবিক্রমে নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যুবরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান করিয়া গিয়াছে। ধন্য মেদিনীপুর ধন্য তাহার বীর সন্তান ক্ষুদিরাম।

১৯০৮ সালের ২রা মে পুলিশ কলিকাতার মুরারীপুকুর উদ্যানে হানা দেয় এবং বন্দুক, টোটা, রিভলভার, রাইফেল, ডিনামাইট, ওয়েলডিং যন্ত্র,

বৈদ্যুতিক ব্যাটারী, ফিউজ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, কিছু পুস্তক এবং একটি নোট বই পায়। ঐ নোট বইয়ের মধ্যে কিছু নাম পাওয়া যায়। পুলিশ তদনুসারে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিভূতি সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রসন্ন মল্লিক, বিজয় নাগ, সচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুঞ্জলাল লাহা, পূর্ণচন্দ্র সেনকে গ্রেপ্তার করে। হেমেন্দ্র গুপ্ত এবং ধরণীনাথ গুপ্তকে ১৩৪নং হ্যারিসন রোড হইতে কানাইলাল দত্ত এবং নিরাপদ রায় ওরফে নির্মলকে গোপীমোহন দত্ত লেন হইতে অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং শৈলেন বসুকে ৮নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে এবং হেমচন্দ্র দাসকে ৮নং নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট হইতে গ্রেপ্তার করা হয়। মেদিনীপুরের পুলিশের বড়কর্তা মি. কর্ণিশ কলিকাতার সি. আই. ডি-র নিকট হইতে একটি সাংকেতিক তারবার্তা পাইলেন কিন্তু তিনি উহার মর্মার্থ বুঝিতে অক্ষম হইলেন। একই সঙ্গে কলিকাতায় ও মেদিনীপুরে যুগবৎ তল্লাসী চালনাই অভিপ্রায় ছিল উহাদের ; কিন্তু মিঃ কর্ণিশ উক্ত তারবার্তার মর্মার্থ অনুধাবন করিতে না পারায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কলিকাতায় একজন ব্যক্তি ২রা মে রাত্রিতে প্রেরিত হইল এবং ১৯০৮ সালের ৩রা মে মেদিনীপুর সহরের শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৈলাসদাস মহাপাত্র, পিয়ারীচরণ দাস, পিয়ারীলাল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, হারাধন চৌধুরী প্রমুখ বহু গৃহে খানা-তল্লাসী করা হইল। পুলিশ শীতলের নিকট হইতে একটি নোট বই, উপেন্দ্রনাথের নিকট হইতে দুইটি তরবারি ও দুইটি বেয়নেট, জ্ঞানেন্দ্র নাথের নিকট হইতে একটি দোনলা বন্দুক, দুটি কুরকী এবং কিছু বই, চিঠি, ফটো প্রভৃতি আরও কিছু সামগ্রী হস্তগত করে। বিনা লাইসেন্সে বন্দুক রাখার অভিযোগে পুলিশ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিল। তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্র নাথ এবং উপেন্দ্র নাথ ঘোষের পুত্র যোগজীবনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। পরে পুলিশ শরৎচন্দ্র সিংহ নামে অপর একটি বালককে গ্রেপ্তার করে এবং যে বাড়ীতে সে গৃহ শিক্ষকের কার্য করিত সেই হারাধন মল্লিকের গৃহ তল্লাসী করিল। কিন্তু এখানে পুলিশ একটি অব্যবহার্য্য তরবারি ব্যতীত কিছুই পাইল না। জ্ঞানেন্দ্রনাথকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু অন্যান্যদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হইল। ১০ তারিখে পিংলার বেলুন গ্রামে উপেন্দ্রনাথের গ্রামের বাড়ী তল্লাসী করিল। পুলিশ বিনা লাইসেন্সে তরবারি রাখার অভিযোগে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, তাঁহার পুত্র যামিনীজীবন ও যোগিনীজীবনকে এবং হারাধন মল্লিককেও গ্রেপ্তার করিল। এই তরবারিগুলি তল্লাসকালে

তাহাদের বাড়ীতে পাওয়া যায়। পরে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে আদালতে হাজির হইবার আদেশ হয় এবং তাঁহার জামিন নাকচ করা হয়। অস্ত্র আইনে পুলিশ তিনটি মামলার পত্তন করে। প্রথম মামলায় উপেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার দুই পুত্র দ্বিতীয় মামলায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ আসামী হইল। ঐ একই দিনে চাঙ্গুয়ালে প্রকাশচন্দ্র মাইতি ও প্রফুল্লচন্দ্র মাইতিকে পুলিশ সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু তাহারা জামিনে মুক্তি পায়। সত্যেন্দ্র তখন জ্বর এবং হাঁপানীতে ভুগিতেছিল। ২০শে জুন উপেন্দ্র, যামিনীজীবন, যোগিনীজীবন, হারাধন ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ অভিযোগ মুক্ত হইয়া খালাস পাইল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ, যোগজীবন এবং শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে মিঃ নেলসনের আদালতে অস্ত্র আইনের ১৯।এফ ধারা মতে অভিযোগ পত্র তৈয়ারী করা হইল। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায়, মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের জেলার ও চারুচন্দ্র দাসের বাড়ী পুলিশ তল্লাসী করিল। এতদ্ব্যতীত কিল্লাপুকুর ও হ্যারিসন দিঘীতেও পুলিশ জাল নামাইল। কিন্তু বোমা অথবা সন্দেহজনক অপর কিছুই কোনোখানেই পাওয়া গেল না। মেদিনীবান্ধব পত্রিকার অফিসও তল্লাসী করিয়া কিছু বই পুলিশ হস্তগত করিল। এই মামলায় সত্যেন্দ্রনাথের দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল, কিন্তু আলিপুর বোমার মামলায় বিচারের সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হইল। অন্যান্য আসামীরা নির্দোষী সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইল। ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই হনুমানজীর মন্দির, পিয়ারীচরণ দাসের, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের, যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র দাসের এবং দেবদাসকরণের বাড়ী ও বসন্ত মালতী আখড়া এবং অন্যান্য স্থান তল্লাসী করা হইল। সন্তোষের বাড়ী হইতে কিছু খাতা, বন্দেমাতরম প্রতীক চিহ্ন ও ছোট ছোট লৌহ গোলক পাওয়া গেল এবং সন্তোষকে গ্রেপ্তার করা হইল। ঐ দিন সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, জন্মেঞ্জয় মল্লিক, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, অখিলচন্দ্র সরকার, নরেন সরকার এবং অভয়চরণ কুণ্ডুর বাড়ী ও মেদিনীবান্ধব পত্রিকার অফিসও তল্লাস করা হইল। রাসবিহারী বসুর বাড়ী ও মেদিনীবান্ধব পত্রিকার অফিসটি ঐদিন পুনরায় তল্লাস করা হইল এবং রাসবিহারীর বাড়ী হইতে পুলিশ কয়েকটি চিঠিপত্র, কিছু ফটো এবং ভাঙ্গা তরবারি হস্তগত করিল এবং মেদিনীবান্ধব পত্রিকার অফিস হইতে একটি পুরাতন বর্শা, কিছু নাইট্রিক এ্যাসিড, টেলিগ্রাম ফরমের একটি বই এবং

১৬টি চিঠি হস্তগত করা হইল। পুলিশ ২৩শে জুলাই পিয়ারীলাল দাস, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিল। পুলিশ গঙ্গারাম দত্তর বাড়ীও সার্চ করিল এবং একটি ছোট বোমা পাইল। তাহার পৌত্র সারদা, বরদা এবং কমল দত্ত, তাহার ম্যানেজার মধুসূদন দত্ত এবং মুহুরী শ্যামলাল সাহাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধৃত হইলেন। ২৮শে আগষ্ট বহু স্থানে পুলিশ তল্লাসী চালাইল। গোপের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনের প্রাসাদ, নাড়াজোল রাজকাছারী, নাড়াজোলের প্রাসাদ, শিরোমণিতে দেবদাস করণের বাড়ী এবং নিম্নলিখিত অন্যান্য ব্যক্তির বাড়ীও তল্লাসী করা হইল অবিনাশচন্দ্র মিত্র, যামিনীনাথ মল্লিক, প্রমথনাথ কর, উপেন্দ্রনাথ মাইতি, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র চাবরী, যতিন্দ্রনাথ দাস, চারুচন্দ্র দাস, যোগজীবন ঘোষ, রাসবিহারী বসু, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত, আশুতোষ দাস প্রভৃতি এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করিল। ১৯০৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোতওয়ালী থানায় লিখিত প্রথম এত্তেলাতে দেখা যায়: "এইরূপ জানা যায় যে ১৫৪ জন ষড়যন্ত্রকারী ২৩টি আড্ডায় মিলিত হইয়া মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে।"

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের নারায়ণগড় ট্রেন ধ্বংস প্রচেষ্টার মামলায় তদন্তকালীন প্রকাশ পায় যে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে ও অন্যত্র ব্যাপিয়া একটি গুপ্ত সমিতির একটি ষড়যন্ত্র বর্তমান যাহার উদ্দেশ্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোমা, বিস্ফোরক অথবা যে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা হত্যা করা। যে যে স্থানে ষড়যন্ত্রকারীরা মিলিত হইয়া গুপ্তচক্রের সভ্যবৃন্দ এই প্রকার নানা বে-আইনী সলাপরামর্শ করিত তাহার মধ্যে নিম্নে কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করা হইল।

১। বসন্তমালতী আখড়া—মেদিনীপুর।

২। মল্লিকের রাসমঞ্চ—মেদিনীপুর।

৩। কামিনী বারবনিতার বাড়ী।

৪। গোপালচন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়ী।

৫। যামিনীনাথ মল্লিকের বাড়ী।

৬। মাহিষাদলের রাজবাড়ী।

৭। গঙ্গারাম দত্তর বাড়ী।

৮। দেবদাস করণের বাড়ী।

৯। উপেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়ী।

১০। ত্রৈলোক্যনাথ পালের বাড়ী।

১১। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী।

১২। পিয়ারীলাল ঘোষের বাড়ী।

১৩। অধরচন্দ্র রায়ের বাড়ী।

১৪। যোগেন্দ্র মল্লিকের বাড়ী।

১৫। রাজবালা বারবণিতায় বাড়ী।

১৬। আই, সি, এস ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বি, সি দের বাড়ী।

১৭। ডাঃ অম্বরচন্দ্র সরকারের বাড়ী।

১৮। উমেশচন্দ্র দত্তর বাড়ী।

১৯। হনুমানজীর মন্দির।

২০। বক্সীবাজারে ময়ূরভঞ্জের রাজবাড়ী।

২১। লক্ষ্মী প্রেস।

২২। লালদিঘী।

প্রায় ১৫৪ জন ষড়যন্ত্রকারী সময় সময় ঐস্থানে মিলিত হইত। এ সব ষড়যন্ত্রকারী নিম্নলিখিত ব্যক্তি হইতেছে।

১।	অখিলচন্দ্র সরকার	পেস্কার	মীরবাজার
২।	আশুতোষ দাস	পোষ্টাপিসের সর্টার	ঐ
৩।	নবীনচন্দ্র পাটেল	জমিদার	ঐ
৪।	যামিনীকান্ত মল্লিক	ঐ	ঐ
৫।	প্রমথনাথ বোস	পেস্কার	ঐ
৬।	খগেন্দ্রনাথ সরকার	মিউনিসিপ্যালিটির কেরাণী	ঐ
৭।	কালিচরণ বোস	ঐ	মাণিকপুর
৮।	পূর্ণচন্দ্র চ্যাটার্জি	ডাক্তার	কর্ণেলগোলা
৯।	অভয়চরণ কুণ্ডু		মীরবাজার
১০।	রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু	ছাত্র	কলিকাতা মেডিকেল কলেজ
১১।	পরাণ চাবরী	সূত্রধর	মাণিকপুর
১২।	হেমচন্দ্র কুণ্ডু	জমিদার	মীরবাজার
১৩।	পরিতোষ দাস	ছাত্র	ঐ

১৪।	সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি	হনুমানজীর মন্দিরের পূজারী	মীরবাজার
১৫।	সুরেন্দ্রনাথ বোস		ঐ
১৬।	রাখালচন্দ্র পাল	রোডসেস ক্লার্ক	ঐ
১৭।	সারদা নাগ	জমিদার	কেরাণী টোল
১৮।	রাধানাথ পতি	উকিল	মীরবাজার
১৯।	জগন্নাথ ভকত	জমিদার	কর্ণেলগোলা
২০।	অতুলচন্দ্র বসু	ছাত্র	ঐ
২১।	পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী	সিভিল সার্জেনের কেরাণী	মীরবাজার
২২।	আশুতোষ কুণ্ডু	দোকানদার	ঐ
২৩।	মন্মথনাথ বোস	টীকাদার ইন্সপেক্টর	ঐ
২৪।	খগেন্দ্র প্রঃ রমেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি	উকিল	ঐ
২৫।	নটবর দত্ত	জমিদার	ঐ
২৬।	গোবিন্দচন্দ্র মুখার্জ্জি	ছাত্র	ঐ
২৭।	হরেন্দ্রনাথ সরকার	ঐ	চিড়িমারসাই
২৮।	মন্মথনাথ কর	জমিদার	মীরবাজার
২৯।	মতিলাল মুখার্জ্জি	উকিল	ঐ
৩০।	সত্যচরণ কর	পুলিশ একাউনটেন্ট	ঐ
৩১।	নিকুঞ্জবিহারী মাইতি	রোডসেস ক্লার্ক	মাণিকপুর
৩২।	শশীভূষণ লাহা	ডাক্তার	মীরবাজার
৩৩।	হরিকৃষ্ণ পাটেল	জমিদার	মাণিকপুর
৩৪।	যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ	মীরবাজার
৩৫।	মোনমোহন সিংহ	ঐ	শিববাজার
৩৬।	গিরা বেনিয়া	ঐ	মাণিকপুর
৩৭।	যতীন্দ্রনাথ দাস	ছাত্র	পাহাড়ীপুর
৩৮।	গোষ্ঠ বিহারী দে		সুজাগঞ্জ
৩৯।	সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস	ছাত্র	বল্লভপুর
৪০।	গোবিন্দ পাল	মোক্তার	মীরবাজার
৪১।	রঘুনাথ সাহা	ঐ	ঐ
৪২।	জয়হরি বেরা	উকিল	কর্ণেলগোলা
৪৩।	নিবারণ চন্দ্র মিত্র	ঐ	অলিগঞ্জ
৪৪।	গোঁসাইদাস ঘোষ	রোডসেস ক্লার্ক	মীরবাজার

৪৫।	লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত	জমিদার	মীরবাজার
৪৬।	কুঞ্জমিত্র	কর্ম্মকার	ঐ
৪৭।	রামচন্দ্র নন্দী	দোকানদার	ঐ
৪৮।	নন্দ রায়		আলিগঞ্জ
৪৯।	আনন্দ চরণ পাল	রাজ ওভার সিয়ার	মীরবাজার
৫০।	সতীশ বিশ্বাস	কালেক্টারেটের ক্লার্ক	বাড় মাণিকপুর
৫১।	আশুতোষ দত্ত	দোকানদার	ঐ
৫২।	শিব বেরা	ঐ	ঐ
৫৩।	আশুতোষ দে	ঐ	ঐ
৫৪।	ভুবনচন্দ্র পাল	টাউট কালেকটোরেট	কোত্‌ওয়ালীবাজার
৫৫।	আশুতোষ রায়	জমিদার	বাঁকুড়া
৫৬।	সরোজরঞ্জন পাল	ঐ	কেরাণীটোলা
৫৭।	অবিনাশ চন্দ্র মিত্র	ঐ	ঐ
৫৮।	যোগজীবন ঘোষ	ছাত্র	বিবিগঞ্জ
৫৯।	গোপালচন্দ্র ব্যানার্জ্জি	উকিল	মীরবাজার
৬০।	হেমচন্দ্র কর	কেরাণী	ঐ
৬১।	সতীশচন্দ্র রায়	কালেক্টরীর টাউট	মাণিকপুর
৬২।	ভোলা ভকত	ছাত্র	কর্ণেলগোলা
৬৩।	বিজয় দত্ত	ঐ	ঐ
৬৪।	কিষণ সাহা	দোকানদার	মীরবাজার
৬৫।	বরদাপ্রসাদ দত্ত	জমিদার	ঐ
৬৬।	সত্য চরণ কর	দোকানদার	ঐ
৬৭।	শীতল প্রসাদ রায়	রেলের কেরাণী	আলিগঞ্জ
৬৮।	মন্মথনাথ মিত্র	ছাত্র	ঐ
৬৯।	শৈলজানন্দ সেন	ঐ	মীরবাজার
৭০।	রামমোহন সিংহ	জমিদার	ঐ
৭১।	চারুচন্দ্র বোস	ছাত্র	হবিবপুর
৭২।	ভূদেব দাস	দেওয়ানী আদালতের মুন্সী	মীরবাজার
৭৩।	মন্মথনাথ দে	নাড়াজোলরাজের মুন্সী	চিড়িমারসাই
৭৪।	আশুতোষ সেন	দোকানদার	বিবিগঞ্জ
৭৫।	পূর্ণচন্দ্র দে	ঐ	মীরবাজার

৭৬।	মন্মথনাথ পাল	জমিদার	বল্লভপুর
৭৭।	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী	শীতলা মন্দিরের পূজারী	
৭৮।	ব্রজেন্দ্রনাথ মাইতি	ছাত্র	নূতন বাজার
৭৯।	বিভূতিভূষণ দত্ত	ঐ	পাহাড়ীপুর
৮০।	অমূল্য বোস	ঐ	ঐ
৮১।	নবীন দে	ঐ	সুজাগঞ্জ
৮২।	পিয়ারীলাল দত্ত	ডাক্তার	পাহাড়ীপুর
৮৩।	যতী সিং	ঘড়ি প্রস্তুত কারক	ঐ
৮৪।	আনন্দ প্রসাদ দে	দোকানদার	ঐ
৮৫।	বরেন পাল	উকিল	ঐ
৮৬।	সুরেশ চন্দ্র দাস	দেওয়ানী আদালতের কেরাণী	ঐ
৮৮।	অম্বিকা সিকদার	দোকানদার	বিবিগঞ্জ
৮৮।	চুণীলাল দত্ত	ডাক্তার	বড়বাজার
৮৯।	কান্তি সেন	ঔষধ ব্যবসায়ী	ছোটবাজার
৯০।	অমর চন্দ্র রায়	জজ কোর্টের মোহরী	বল্লভপুর
৯১।	নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত	মহিষাদলের আমমোক্তার	পাহাড়ীপুর
৯২।	দেবদাস করণ	মেদিনীবান্ধব পত্রিকার সম্পাদক	হবিবপুর
৯৩।	উমাচরণ মিত্র		ঐ
৯৪।	অনুকুল চন্দ্র মিত্র		হবিবপুর
৯৫।	হারাধন দে		ঐ
৯৬।	রামশরণ রায়	রত্ন ব্যবসায়ী	কোত্‌বাজার
৯৭।	যদুনাথ সাহা	ঐ	ঐ
৯৮।	রাসবিহারী বসু	ড্রইং মাষ্টার	ঐ
৯৯।	সত্যেন্দ্রনাথ বসু		ঐ
১০০।	যোগজীবন ঘোষ		ঐ
১০১।	ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ	উকিল	নবাইগঞ্জ
১০২।	শম্ভুনাথ রায়	ঐ	মীরবাজার
১০৩।	কৈলাস দাস	মোক্তার	ঐ
১০৪।	গঙ্গাধর বোস	উকিল	ঐ
১০৫।	সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	ছাত্র	ঐ
১০৬।	সন্তোষ দাস	পুলিশের সহকারী ইনসপেক্টর	ঐ

১০৭।	যতীন্দ্রনাথ সেন		মীরবাজার
১০৮।	জ্ঞান ব্যানার্জ্জি	কালেক্টরীর কেরাণী	ঐ
১০৯।	মন্মথনাথ নাগ	ডাক্তারী ছাত্র	কোতালীবাজার
১১০।	উপেন্দ্রনাথ মাইতি	উকিল	নূতন বাজার
১১১।	হারাধন মল্লিক	জমিনদার	হবিবপুর
১১২।	বিনোদ সাহা	রত্ন ব্যবসায়ী	কোত্‌বাজার
১১৩।	প্রশান্ত সাহা	ঐ	ঐ
১১৪।	রাজকুমার সিংহ	ছাত্র	ঐ
১১৫।	শরৎ চাবরী	রত্ন ব্যবসায়ী	হবিবপুর
১১৬।	জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	জমিনদার	কর্ণেলগোলা
১১৭।	চারুচন্দ্র দাস	ছাত্র	সঙ্গত বাজার
১১৮।	ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী	মলিহাটির জমিদার	কোতবাজার
১১৯।	মধুসূদন দত্ত	উকিল	মীরবাজার
১২০।	সত্যচরণ মুখার্জ্জি	মোক্তার	বল্লভপুর
১২১।	রাজেন্দ্রলাল ব্যানার্জ্জি		মঙ্গলতলা
১২২।	শ্রীনারায়ণ পাল	কলাইকুণ্ডার জমিদার	বল্লভপুর
১২৩।	শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী	ডাক্তার	চিরিমারসাই
১২৪।	কুমেদ ঘোষ	উকিল	বল্লভপুর
১২৫।	তাদ্দক খাঁ	গায়ক	বিবিগঞ্জ
১২৬।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার	টাউট	মীরবাজার
১২৭।	মিহিরচন্দ্র দত্ত	ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এ্যাকাউনটেণ্ট	মীরবাজার
১২৮।	মাণিক দাস	টাউট	ঐ
১২৯।	ভূপতি মল্লিক (রতন)	জমিনদার	ঐ
১৩০।	নিবারণ কুণ্ডু	দোকানদার	ঐ
১৩১।	উপেন্দ্র সরকার	টাউট	ঐ
১৩২।	সারদাপ্রসাদ দত্ত	জমিনদার	ঐ
১৩২।	প্রভাস দত্ত	ছাত্র	ঐ
১৩৪।	উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	উকিল	ছোটবাজার
১৩৫।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু	শিক্ষক	গোলকুঁমারচক
১৩৬।	ত্রৈলোক্যনাথ পাল	উকিল	সঙ্গতবাজার
১৩৭।	প্রকাশচন্দ্র মাইতি	ঐ	ঐ

১৩৮।	পিয়ারীলাল ঘোষ	উকিল	আলিগঞ্জ
১৩৯।	শ্যামলাল সাহা	জমিদারী সেরেস্তার মোহরী	খাপরেল বাজার
১৪০।	নরেন্দ্রলাল খান	রাজা	নাড়াজোল
১৪১।	হীরালাল সেন	পুলিশের অস্থায়ী সাব-ইন্সপেক্টর	কেশপুর
১৪২।	সতীশচন্দ্র দাস		পাহাড়ীপুর
১৪৩।	যোগী সাহা	রত্ন ব্যবসায়ী	কোতবাজার
১৪৪।	সুকুমার রায়	পেস্কার	মাণিকপুর
১৪৫।	প্রসাদচন্দ্র মিত্র	জমিনদার	কেরাণীটোলা
১৪৬।	গোকুল ঘোষ	টাউট	নারায়ণগড়
১৪৭।	অতুলচন্দ্র বোস	ছাত্র	চিড়িমার সাই
১৪৮।	অনুকুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি	জমিনদার	ঐ
১৪৯।	ভরতচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি	পেস্কার	বড়মাণিকপুর
১৫০।	মণীন্দ্র ঘোষ	ছাত্র	পিংলা
১৫১।	সত্যচরণ রক্ষিত		শিববাজার
১৫২।	লক্ষ্মীনাথ দাস		ঐ
১৫৩।	বিজয় কুমার দে	ছাত্র	মাণিকপুর
১৫৪।	শরৎচন্দ্র দত্ত	ঐ	মীরবাজার

৪ঠা সেপ্টেম্বর নাড়াজোল রাজ নরেন্দ্রলাল খাঁন সমেত ধৃত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয় কিন্তু ঐ আবেদন নামঞ্জুর করা হইল। ৭ই সেপ্টেম্বর জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র শ্রদ্ধেয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন, যামিনীনাথ মল্লিক, উপেন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য প্রায় সাত হাজার ব্যক্তি আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। বিপদের ভয় দেখাইয়া আইনজীবিদের পুলিশ ঐ সব আসমীদের পক্ষসমর্থন করিতে নিষেধ করে। কিন্তু কে, বি, দত্ত, এ, চৌধুরী, এইচ মল্লিক, কিজ, গডফ্রে, এ, সি, দত্ত কৌশলীবৃন্দ পিয়ারী ঘোষ ওকিল এবং মনমোহন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিপ্রসাদ চ্যাটার্জ্জি, উপেন্দ্রনাথহাজরা, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী, সন্তোষকুমার ব্যানার্জ্জি প্রমুখ আইন ব্যবসায়ীর সহায়তায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে আগাইয়া আসেন। সরকারী উকিল হিসাবে বারিষ্টারও কৌশলী বি, কে, বসু আদালতে উপস্থিত হন। রাজা এবং অন্যান্য সমস্ত আসামীকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের কুখ্যাত পশ্চিম ডিগ্রীর নির্জ্জন কারা প্রকোষ্ঠে এককভাবে আটক রাখা হয়।

সহরের লোক ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিরাপত্তার জন্য পলাইতে থাকে মফঃস্বল হইতে সহরে জনসমাগম একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। পুলিশ ও সি আই ডি-র লোকেরা সহরের লোকদের বেপরোয়াভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্ররোচিত করিতে থাকে। ১৯শে সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করা হইল। মধুসূদন দত্ত, শ্যামলাল সাহা, সারদা দত্ত, বরোদা দত্ত ও নিকুঞ্জ মাইতি ব্যতীত সকলেরই জামিনের আদেশ নামঞ্জুর হইল। রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে সর্ত্তাধীনে জামিন দেওয়া হয়। এইরূপ আদেশ হয় যে তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ে তাঁহার প্রাসাদে পুলিশ প্রহরা বসিয়ে এবং তাঁহার আত্মীয় ও স্বকীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তিনি যোগোযোগ করিতে পারিবেন না। ২৩শে সেপ্টেম্বর ৫০,০০০ করিয়া দুই জন জামিনদারের জামিনে রাজা মুক্ত হন। মুক্তি পূর্ব্বে তাঁহার কাছারীর সর্ব্বত্র তল্লাসী করা হয়। তল্লাসকারী পুলিশদল রাজকাছারীতে রক্ষিত সমস্ত তরবারি, রাইফেল বন্দুক ও কার্টরিজ হস্তগত করিয়া একটি ঘরে রাখিয়া চাবি লাগাইয়া চাবি নিজেদের কাছে রাখিল। রাজাকে দ্বিতলে থাকিতে দেওয়া হইল। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বেয়নেট সমেত রাইফেল লইয়া প্রহরায় নিযুক্ত হইল। প্রধান দুইটি ফটকে দুইজন নীচতলায় অফিসের সম্মুখে দুইজন, দুইজন সিঁড়িতে উপরতলায় প্রহরী বসান হইল। ম্যানেজার, রাণী, রাজার দুই পুত্র, তাঁহার খুল্লতাত, খুড়ীমা, জামাতা, জামাতার ভাই, ছয়জন ভৃত্য, রাজশ্বশুর, দুইজন পাংখাপুলার ও একজন পাচক মাত্র রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইল।

১৯০৮ সালের ৬নং বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারায় ৪ (ক) ও ৪ (খ) এবং ৬ ধারামতে অতিরিক্ত সেসন জজ সাহেবের এজলাসে সন্তোষচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং যোগজীবন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হইল। অন্য সমস্ত আসামীকে ডিসচার্জ্জ করা হইল। এইরূপ অভিযোগ আনা হয় যে ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের ফলে মেদিনীপুরের যে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, উত্তেজনাময় বক্তৃতা ও উদ্দীপনাময় পুস্তক পুস্তিকা সমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে ফলে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বালক ও তরুণ সম্প্রদায় সরকার তথা বিদেশীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও শত্রুতার ভাব পোষণ করিতে সুরু করে। বর্ত্তমান আসামীগণ একটি ষড়যন্ত্র করে যে রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ বিশেষ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টনকে আগ্নেয়াস্ত্র ও

বিস্ফোরক অস্ত্রাদির সাহায্যে হত্যা করা হইবে। তল্লাসী কালে আসামী সন্তোষকুমার দাসের নিকট একটি বোমা এবং আসামীদের দ্বারা রক্ষিত আর একটি বোমা সারদা দত্ত ও বরোদা দত্তর গৃহে পাওয়া যায়।

সরকার পক্ষ প্রারম্ভিক অভিযোগে আরও বলে যে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী হিংসাত্মক বক্তৃতা দেয়। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থানীয় প্রদর্শনীতে লিয়াকৎ হোসেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং মনোরঞ্জন গুহ আসিয়া বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী প্রচারে ভাষণ দেন। ইহার পর হইতে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়িতে থাকে এবং সভা সমিতি ও শোভাযাত্রা চলিতে থাকে এবং ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রদর্শনীতে মিঃ ওয়েষ্টন বন্দেমাতরম্ ব্যাজ ব্যবহারে আপত্তি করেন কারণ তিনি মনে করেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেই ঐ ব্যাজ ধারণের জন্য জিদ করা হয়। ফলে স্থানীয় পত্রিকা মেদিনীবান্ধবে মিঃ ওয়েষ্টনের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা প্রচার করে। ঐ পুস্তিকায় জনসাধারণকে ইউরোপীয়দের হত্যায় প্ররোচিত করে। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতের মামলা উঠাইয়া লওয়া হয়। ইহার পর ক্ষুদিরামের গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ একটি গাড়ীতে তাহাকে বসাইয়া বিজয় উল্লাসে শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। জনসাধারণের মধ্যে সেই সময় কি প্রকার মনোভাব বিরাজ করিতেছিল ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক রামচন্দ্র সেন ক্ষুদিরামের মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষী দেন। তিনজন ব্যক্তি তাঁহাকে রাত্রিতে টানিয়া আনিয়া অপমান করে এবং একটি নির্জ্জন রাস্তায় তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন স্বদেশী বিপণন ছাত্র ভাণ্ডারের কর্ম্মী এবং সে সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ ও অন্যান্য সংবাদপত্র বিলি করিত। এই বিপণিতে ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

সত্যেন্দ্রনাথ একজন পণ্য বিক্রেতাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া পত্র দেন এবং তাহাকে বিলাতী সামগ্রী বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হয়। ঐ পণ্য বিক্রেতা এই আদেশ অবহেলা করায় তাহার দোকান পুড়াইয়া দেওয়া হয়। আর একজন দোকানদার তাহার কর্ম্মচারীকে বিলাতী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কাজে পাঠায়—তাহার প্রতি এ্যাসিড নিক্ষিপ্ত হয়। আর একজন দোকানদারকে উকিল ও জনসাধারণ সকলেই বর্জ্জন করে ও একঘরে করে। ঐ দোকানদার

এবং অন্য আর একজন বাধ্য হইয়া সালিশী স্বীকার করে এবং তাহাদের ১০০০৲ টাকা জরিমানা হয়। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয় বন্ধ না করায় আর একটি দোকান লুণ্ঠিত হয়।

হিংসাত্মক কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য ব্যাপক প্রচার হয়। বহু ব্যক্তি হিংসাত্মক কার্য্যে ব্রতী হইতে উন্মুখ হয় এবং তাহাদের বহু সমর্থক ছিল। দোকানদারদের ভীতি প্রদর্শন করিয়া আন্দোলনকারীরা স্তব্ধ রাখে। তাহারা প্রয়োজনীয় জনমত গঠনে উৎসুক ও তৎপর ছিল। সাক্ষী সংগ্রহ করিতে খুবই বেগ পাইতে হয়। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকার পক্ষে সাক্ষ না দিতে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাক্ষীদের প্ররোচনা দিতেছে।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সমাবেশ হয়। ডেলিগেটদের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হয়। স্বরাজ সম্পর্কে ভাষণ দিবার জন্য কে, বি দত্ত অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু স্বরাজ সম্পর্কে তিনি বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এবং তিনি বিজাতীয় পোষাক পরিহিত ছিলেন বলিয়া চরমপন্থী বলিয়া কথিত একদল লোক এই সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ও পৃথক সভায় মিলিত হয়। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দও ঐ সমাবেশ পরিত্যাগ করে। সভায় ডেলিগেট কেহ আর থাকিল না এবং সভায় মাত্র স্বেচ্ছাসেবক সমেত শতখানেক ব্যক্তি থাকিলেও তাহারা নরমপন্থীদের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিল।

এই সময় মেদিনীপুরের অদূরে লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের ট্রেন উড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টা হয়। ইহার ফলে ব্যাপক তদন্ত ও পুলিশী ব্যবস্থা ও হয়। ফলে বন্দেমাতরম শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি এবং আখড়ার ব্যায়াম প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়।

সন্তোষ নিজে স্বেচ্ছাসেবক ও উহাদের ক্যাপটেন ছিল। তাহার বাড়ীতে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এ ছাড়া বসন্ত মালতী আখড়ার জমির লীজ পত্র, বন্দেমাতরম ব্যাজ, এবং জাতীয় পতাকা ইত্যাদিও তাহার নিকট হইতে ধৃত হয়। সন্তোষ রাঁচীতে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর হিসাবে ট্রেনিং লইতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথ ক্যাপটেন হয়। ক্ষুদিরামের দ্বারা রাজদ্রোহ মূলক পুস্তিকা প্রচারের পর কালেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন সত্যেন্দ্রনাথকে কেরানীর চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। যোগজীবন ক্ষুদিরাম, শরৎচন্দ্র দে সনাতন সমিতির নেতা ছিলেন। আবদুর রহমান এই

আখড়ার শিক্ষক ছিল। এই লোকটি ফেরিওয়ালার ও পরে কসাইয়ের কাজ করিত—তাহার সামাজিক মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু সে জিমন্যাষ্টিক খুব ভাল জানিত বলিয়া তাহাকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মাসিক ২৫ টাকা বেতনে তাহাকে গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সে অন্যান্য খেলার মধ্যে তরবারি ও ছোরা খেলা শিখাইত। সে তাহার সাক্ষে বলিয়াছে যে ষড়যন্ত্রকারীরা অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে লালা লজপৎ রায়, হেমদাস কানুনগো এবং শিবাজীর কথা বলিত এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্ররোচনা দিত। সত্যেন, যোগজীবন, ক্ষুদিরাম, শরৎ এবং অন্যান্য ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছে যে লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের ট্রেন উড়াইয়া দিবার কীর্ত্তি তাহাদের। খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরক পাঁচ ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট গভীর গর্ত্তের মধ্যে রাখা হয়। ঐ বিস্ফোরক বিপ্লবীদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, ঐ স্থানে নীত হয় ও গর্ত্তে রাখা হয়। কোন সময় ট্রেনটি ঐ খান দিয়া যাইবে সে বিষয়েও খোঁজ খবর রাখা হয়।

জানুয়ারীতে সবং মামলা নামে খ্যাত একটি স্বদেশী মামলা হয়। সত্যেন্দ্র যোগজীবন, সুরেন্দ্র এবং ক্ষুদিরাম এ বিষয়ে আলোচনা করে। সত্যেন্দ্র বলে যে সে শুনিয়াছে যে মিঃ ওয়েষ্টন ঐ মামলার আসামীদের কখনই অব্যাহতি দিবেন না। ক্ষুদিরাম অভিমত প্রকাশ করে যে মিঃ ওয়েষ্টনকে গুলী করিয়া হত্যা করা আশু প্রয়োজন—ইহাতে ষড়যন্ত্রকারীরা সকলেই সম্মত হয়।

মিঃ ওয়েষ্টন তখন ঝাড়গ্রামে ছিলেন। শরৎ ও ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর হইতে অন্তর্হিত হইল। আবদুল রহমান মৌলভী মাজরুল হককে সতর্ক করিয়া দেন, তিনি মিঃ করনিসকে সংবাদ দেন। মিঃ করনিস তৎক্ষণাৎ ঝাড়গ্রামে গিয়া মিঃ ওয়েষ্টনকে সতর্ক করিয়া দেন। ফলে ঐ মতলব ব্যর্থ হয়। একদিন সত্যেন্দ্র রিভলভার লইয়া ইউরোপীয়ন ক্লাবে যায়। ঐ ক্লাবে তখন বহু ইউরোপীয়ান সমবেত হইয়াছিল। সে রিভলভার উঠাইয়াছিল—কিন্তু অতদূর হইতে লক্ষ্যভেদ করা যাইবে না বিবেচনায় গুলীবর্ষণ করে নাই। সত্যেন্দ্র মিঃ ওয়েষ্টনের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করিত মনে হয়।

৮ই এপ্রিল ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর হইতে সরিয়া গেল। ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। ৩রা মে সত্যেন, যোগজীবন ও শরৎচন্দ্র দে ধৃত হয়। সত্যেন্দ্রকে অস্ত্র আইনে দণ্ডিত করা হয় ও আলিপুর বোমার মামলায় বিচারাধীন বন্দী হিসাবে সেখানে প্রেরণ করা হয়। ক্ষুদিরামের মজঃফরপুরে বিচার হয়। এই সময় একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। তাহাতে

বলা হয়—"প্রতি জেলায় দুইশত করিয়া তরুণকে লইয়া একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হউক। সকলে একযোগে নির্দ্ধারিত সময়ে অস্ত্র ধারণ করিয়া দুষ্ট ইংরাজদের মস্তক দেহচ্যুত করুক।" ৩০শে জুন পর্য্যন্ত যোগজীবন করাগারে থাকে। শরৎচন্দ্র দে অস্ত্র আইনে দণ্ডিত হয়। আবদুর রহমানের সহিত যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগাযোগ ছিল তাহাদের সরাইয়া রাখালচন্দ্র লাহাকে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়। এই লোকটিও একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিল। এই লোকটি এক বিরাট সংখ্যক লোকের নাম পেশ করে। ইহাদের মধ্যে জেলার বহু বিশিষ্ট ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও ছিলেন। তাহার দেওয়া সংবাদ মতে ১৫৪ জন ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হয় এবং সহরের বহু গৃহে তল্লাসী করা হয়। ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই তারিখে সন্তোষের বাড়ী তল্লাসী করিয়া একটি বোমা পাওয়া যায়। রাখালের দাখিলী সংবাদ মতে ৩১শে জুলাই পুনরায় তল্লাসী করিয়া সারদা ও বরদা দত্তর বাড়ীতে একটি বোমা পাওয়া যায়। ১৯০৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাজারুল হক ১৫৪ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম এত্তেলা দেন। তাহার পর বর্ত্তমান আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করে। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে ইহারা ব্যাপক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল—যাহার অন্যতম লক্ষ্য ছিল মিঃ ওয়েষ্টনকে বোমা অথবা বন্দুকের গুলী দ্বারা নিধন করা।

দায়রা বিচারের প্রারম্ভিক তদন্তকালে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে রাখালচন্দ্র লাহা অস্বীকার করে যে সে পুলিশের নিকট কোনো প্রকার সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিল—ফলে ২৪ জন ব্যক্তি মুক্তি পায়। অবশিষ্ট এই তিনজন দায়রা সোপর্দ্দ হয়।

সন্তোষের বাড়ী তল্লাসী কালে বৈঠকখানার এক কোণে একটি বোমা পাওয়া যায় ইহা চৌকাঠের নীচে দরজার পাল্লার কাছে দেওয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিল এবং একটি তক্তা ঐ দরজার গায়ে হেলান দেওয়াভাবে দাঁড় করাইয়া উহা লুকান ছিল। অস্ত্র বিশেষজ্ঞ মিঃ টার্ণারের সাক্ষ্য মতে এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিলে ১০ ফুটের মধ্যে যে কেহ থাকিবে তাহার সুনিশ্চিত মৃত্যু। উহা দুই ফুট উচ্চ হইতে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী।

সন্তোষ যাহাতে স্বীকারোক্তি করে সেজন্য মিঃ ওয়েষ্টন যথেষ্ট চাপ দেন। সন্তোষ প্রথমতঃ স্বীকার করে নাই কিন্তু পরে ২৯ তারিখে স্বীকারোক্তি দেয়। পুলিশ ও মিঃ ওয়েষ্টন সন্তোষকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া এবং প্রলোভন দিয়া

ঐ স্বীকারোক্তি আদায় করে। শুধু সন্তোষ একাই নয়—তাহার পিতা ও ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডের ভয় দেখায়। সন্তোষ স্বীকারোক্তি দিলে তাহাদের গ্রেপ্তার ও নির্য্যাতন করা হইবে না অন্যথায় অকথ্য অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হয়। পিয়ারী ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের পুত্রকে স্বীকারোক্তি দিতে প্ররোচিত ও অনুরোধ উপরোধ করেন—কিন্তু তাঁহারা বিফল হন। ফলে পীয়ারীকে ২৩শে তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। মাতার অশ্রু ও পিতার আবেদন, মৌলভী ও লালমোহন সকলের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কিন্তু পিয়ারীর গ্রেপ্তারে বিচলিত হইয়া সন্তোষ অবশেষে স্বীকারোক্তি দেয়—কিন্তু প্রাথমিক তদন্তকালে সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। ১৯০৮ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে কমিটিং; ম্যাজিষ্ট্রেট এস. ডি. ও মিঃ সি. এইচ. রেইড্ প্রাথমিক তদন্ত করেন। তিনি ১৫৪ জনের মধ্যে ২৩ জনকে দায়রা সোপার্দ্দ করেন। তাহাদের নাম —(১) নরেন্দ্রলাল খাঁন (২) যামিনীনাথ মল্লিক (৩) উপেন্দ্রনাথ মাইতি (৪) গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত (৬) কৈলাসচন্দ্র দাস মহাপাত্র (৭) অখিলচন্দ্র সরকার (৮) কিষাণ সাহা (৯) অবিনাশচন্দ্র মিত্র (১০) মন্মথনাথ কর (১১) যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২) মধুসূদন দত্ত (১৩) মতিলাল মুখোপাধ্যায় (১৪) দেবদাস করণ (১৫) রাসবিহারী বসু (১৬) পরাণচন্দ্র চাবরী (১৭) যতীন্দ্রনাথ দাস (১৮) গোষ্টবিহারী চন্দ (১৯) যোগজীবন ঘোষ (২০) সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২১) সন্তোষচন্দ্র দাস (২২) সারদাপ্রসাদ দত্ত (২৩) বরদাপ্রসাদ দত্ত (২৪) নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (২৫) শ্যামল সাহা (২৬) গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (২৭) আশুতোষ দাস।

সারদা ও বরদার দলীল দস্তাবেজের ঘর হইতে যে বোমাটি পাওয়া যায় সেটি সন্তোষের বাড়ী হইতে প্রাপ্ত বোমাটিরই সদৃশ।

মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের পর যোগজীবনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৪ঠা মে হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত আটক রাখা হয়। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামকে ঐ হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দিবার জন্য এবং মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে কিনা বিবেচিত হইতে থাকে।

রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কুমদাচরণ ঘোষ উভয় এ্যাসেসরই সমস্ত আসামীকে সমস্ত অভিযোগেই নির্দ্দোষী ঘোষণা করেন। কিন্তু এ্যাডিশানাল জজ মিঃ স্মিথার ১৯০৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে রায় দান করিয়া তাহাদের দোষী সাব্যস্ত করেন এবং সন্তোষ ও যোগজীবনকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও সুরেন্দ্রের সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

হাইকোর্টে আপীল করা হইল এবং ঐ আপীল প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্‌স ও বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে শুনানী হইল। তাঁহারা ১৯০৯ সালের ১লা জুন তারিখে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিলেন। মেদিনীপুরের এ্যাডিশানাল সেসনস জজসাহেব ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনের ৪ (ক) ধারামতে যোগজীবনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১০ বৎসরের জন্য দীপান্তর ও সন্তোষকে উক্ত আইনের ৪ (ক) ৪ (খ) এবং ৫ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যথাক্রমে ১০ বৎসর ও ৭ বৎসরের দ্বীপান্তর আদেশ দেন কিন্তু উভয় দণ্ডাজ্ঞা একই সঙ্গে কার্য্যকরী হইবে এইরূপ আদেশ দেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ঐ আইনের ৪, ৫, ৬ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৭ বৎসরের জন্য দীপান্তর আদেশ দেন।

১৯০৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রথম এত্তেলামূলে সরকার পক্ষের মামলা এইরূপ ছিল—মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোমা ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা হত্যার মানসে একটি গুপ্ত সমিতির দ্বারা মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানে ষড়যন্ত্র করা হয়। ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি হিসাবে ২৩টি স্থানেরউল্লেখ করা হয় এবং এই কথিত ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যাইবে এইভাবে যে রাস্তা হইতে ভিক্ষুক এবং বারাঙ্গনা পর্য্যন্ত সমাজের সর্ব্বস্তরের ১৫৪ জন ব্যক্তিকে এই অভিযোগে লিপ্ত করা হয়।

ইহাদের মধ্যে ২৭ জনকে দায়রা সোপার্দ্দ করা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের পূর্ব্বে এ্যড়ভোকেট জেনারেল মিঃ সিংহের পরামর্শমতে ২৪ জনের বিরুদ্ধে ৯ই নভেম্বর অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। অবশেষে এই তিন-জনের বিচার হয়। ঐ ২৪ জন মুক্তি পায়।

এই মামলায় উল্লিখিত সরকারী অভিমতে এই ষড়যন্ত্রের মূল সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বৈরিতা হইতে এবং এই বৈরিতার উদ্ভব বঙ্গবিভাগ হইতে। এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসবে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সাক্ষ্য দেয় যে বঙ্গ ভঙ্গের সময় হইতে ১৯০৮ সালের মেদিনীপুরে ব্যাপক তল্লাসীর যুগ পর্য্যন্ত বন্দেমাতরম শোভাযাত্রাদির অন্তরালে এই ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল সাধারণভাবে বলা হইয়াছে ১৯০৮ সালের ৮ই জুন তারিখের পূর্ব্বে বিস্ফোরক আইন পাশ হইবার আগে বন্দেমাতরম শোভাযাত্রা সমূহ বাহির হইত, স্বেচ্ছাসেবকরা জমায়েৎ হইত, দৌরাত্মময় পিকেটিং করা হইত। সরকারের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করিবার আহ্বান জানাইয়া সভাসমিতি হইত। হিংসাত্মক কর্ম্ম পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইত তরুণের দলকে ড্রিল ও ব্যায়ামের

দ্বারা আশু সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হইত এবং এই তিন জন আপীলার্থ উহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

মাননীয় বিচারপতিদ্বয় রায়ে উল্লেখ করেন যে উপোরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে সাধারণভাবে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে মাত্র ঐসব ঘটনা সত্য হইতে পারে—কিন্তু বর্ত্তমান আসামীদের বিরুদ্ধে সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণ সন্দেহাতীত-ভাবে এবং সবিশেষভাবে প্রমাণিত হয় নাই—এইজন্য তাঁহারা সমস্ত আসামীকে খালাস দেন।

রাখালচন্দ্র লাহা মেদিনীপুরে পুলিশের গুপ্তচর হিসাবে ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মাসিক ২৫৲ বেতনে নিযুক্ত হয়। সে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পেশ করিত; এবং হেড কনেষ্টবল আসাদুল্লা ঐগুলি লিখিয়া লইত। রাখালচন্দ্র লাহা ঐরূপ গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে ইহা অস্বীকার করায় তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দাখিলের জন্য অভিযোগ আনা হয়। বিচারে তাহার পাঁচ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর আদেশ হয় এবং তিন হাজার টাকার অর্থদণ্ড হয় অনাদায়ে অতিরিক্ত এক বৎসর নয় মাসের কারাবাসের আদেশ হয়। আপীলে দণ্ডের মেয়াদ কমাইয়া সাড়ে তিন বৎসর করা হয়।

আলিপুর বোমার মামলায় ১৭ জন বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পায়। বারীন্দ্র ও উল্লাস করের মৃত্যু দণ্ড হয়। উপেন্দ্রনাথ, হৃষিকেশ, বীরেন সেন, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, অবিনাশ এবং শৈলেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হয়। নিরাপদ, শিশির ও পরেশের দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর আদেশ হয় এবং বালকৃষ্ণের সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর আদেশ হয়। হাইকোর্ট বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কমাইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেন।

আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বিরলের এজলাসে দুই দল আসামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা বিচারাধীন ছিল। নরেন গোস্বামী ও কানাইলাল দত্ত প্রথম দলে এবং সত্যেন দ্বিতীয় দলে ছিলেন। মিঃ বিরলে ১৯ই মে প্রথম দলের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতে সুরু করেন। ২৩শে জুন নরেনকে রাজার মার্জ্জনা মঞ্জুর করা হয়। নরেনকে প্রথমদলের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হিসাবে ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে মে এবং ২৯শে জুন ও ৩রা জুলাই তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে তখনও নরেনের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হয় নাই।

যেদিন হইতে নরেন রাজসাক্ষী হইত স্বীকৃত হইল সেইদিন হইতে তাহাকে ইউরোপীয়দের জন্য ব্যবস্থাপিত করা প্রকোষ্ঠে রাখা হয় এবং সেখানে তাহার সর্ববিধ আরাম বিরামের ব্যবস্থা হয়। ঐখানেই মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সে ছিল। সত্যেন যখন ঐ কারাগারে আসিল তখন তাহাকে ইউরোপীয় কারা প্রকোষ্ঠগুলির নীচে কোয়ারনটাইন ইয়ার্ডে রাখা হয়। সত্যেন হাসপাতালে ২৭শে জুলাই আসে। ১৭ই আগষ্ট তাহাকে হাসপাতাল হইতে ডিস্‌চার্জ করা হয় কিন্তু ঐ একইদিনে পুনরায় তাহাকে ভর্তি করা হয়। ২৭শে জুলাই হইতে নরেন গোস্বামী হত্যা পূর্ব পর্য্যন্ত সত্যেন ঐ হাসপাতালেই ছিল।

৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যায় কানাই হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাহার বুকে বেদনাবোধ করিতেছে এইরূপ বলিয়া কানাই হাসপাতালে আসে। সত্যেনের পার্শ্ববর্তী শয্যায় তাহাকে স্থান দেওয়া হয়। সত্যেন ঐখানে নরেনের সঙ্গে একটু হৃদ্যতা করে এবং জানায় যে সে কিছু বিবৃতি দিতে ইচ্ছুক যাহাতে সরকারের পক্ষে মেদিনীপুর বোমার মামলায় কিছু সুরাহা হইবে। তাহাকে বুঝান হয় যে ঐ বিবৃতি স্থির করিবার জন্য ঐ দুজনের কয়েকটি সাক্ষাৎকার আবশ্যক। সেইজন্য নরেনের ঘন ঘন হাসপাতালে সত্যেনের সঙ্গে কথা কওয়ার জন্য আসা দরকার। সত্যেনের সঙ্গে নরেনের প্রথম সাক্ষাৎকার ২৯শে দ্বিতীয়টি ৩০শে এবং তৃতীয়টি ৩১শে আগষ্ট সঙ্ঘটিত হয়। তৃতীয় দিনেই বিশ্বাসহন্তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

পাহারাওয়ালা অনুপ সিং ইউরোপীয় অঞ্চলে সংবাদ লইয়া যায় যে সত্যেন নরেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। সে সকাল সাতটায় হিগিনস্ নামক একটি ইউরোপীয় বন্দী সমভিহারে ইউরোপীয় কারা প্রকোষ্ঠ হইতে যাত্রা করে। তাহারা যখন হাসপাতালের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতেছিল তখন সত্যেন উপর তলার বারান্দায় লৌহ জালিকার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ তিন জন ব্যক্তি যখন উপর তলায় যাইতেছিল তখন দেখা গেল সত্যেন ১নং ওয়ার্ডের দিকে যাইতেছে ঐখানে কানাই ছিল। উপর তলায় যাইয়া নরেন ও হিগিনস্ প্রথমে ঔষধকক্ষে যায় এবং নরেন হিগিনস্‌কে সত্যেনকে ডাকিতে বলে। হিগিনস্ যেমন ১নং ওয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হইতে গেল তখন দেখিল যে সত্যেন ও কানাই ঔষধকক্ষের দিকে আসিতেছে। সিঁড়ির উত্তরে বারান্দায় নরেন ও সত্যেন আগাইয়া গেল এবং উভয়ে মৃদুভাবে আলাপ করিতে লাগিল।

কানাই, সত্যেন ও নরেন বারান্দায় যাইবার কয়েক মিনিটের পরই একটি শব্দ শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যে নরেন ঔষধকক্ষের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে ও চীৎকার করিয়া বলিতেছে "ভগবানের দোহাই, মিঃ হিগিন্‌স্‌, আমাকে বাঁচাও—ওরা আমাকে গুলী করিবে।" নরেনের পশ্চাতে সত্যেন এবং কানাই একটি অথবা দুইটি রিভলভার লইয়া ছুটিতেছে দেখা গেল। হিগিন্‌স্‌ নরেনকে রক্ষা করিতে গিয়া গুলির আঘাতে আহত হইয়া নিরস্ত হইল। ঔষধ কক্ষে আরও গুলী বর্ষিত হইতেছিল। নরেন ডিসপেন্সারী হইতে ছুটিয়া পলাইল এবং সত্যেন ও কানাই তৎপশ্চাতে গলিপথ ধরিয়া পাটকল পর্য্যন্ত ছুটিল।

এ্যালফ্রেড লিমটন নামক অপর একটি সার্জন সাক্ষ দেয় যে—সত্যেন নরেনের অভিমুখে ছুটিতেছিল এবং তৎপশ্চাৎ কানাই ছুটিতেছিল। উভয় আসামীর হাতেই রিভলভার ছিল। সে ছুটিয়া যায় এবং সত্যেনের সহিত তাহার ধ্বস্তা-ধ্বস্তি হইতে থাকে এবং এই অবস্থায় উভয়ে কারাপ্রাচীরের গায়ে চলিয়া যায়। এমন সময় সে একটি গুলীর শব্দ শুনিতে পায় এবং দেখে নরেন ঘুরিয়া পড়িয়া গেল ও কানাই তাহার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান। কানাই আরও কয়েকটি গুলী করিল—শেষেরটির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে নরেনের মৃত্যু হইল ইতিমধ্যে বিপদসঙ্কেত ধ্বনিত হইতেছিল—কানাই ও সত্যেনকে অবশেষে বিপর্য্যস্ত করিয়া বন্দী করা হইল।

একে অন্যকে সহায়তা করিয়া নরেন গোস্বামীর হত্যার অভিযোগে কানাই ও সত্যেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২।১১৪ ধারা মতে অভিযোগ আনা হয়। বন্দী হিগিনস্‌কে মারাত্মকভাবে আঘাত করিবার জন্য একা কানাইয়ের বিরুদ্ধে ৩২৬ ধারার অভিযোগ। কানাই একটি বিবৃতি দেয়—"আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমি একাই এই কার্য্যের জন্য দায়ী অপর কেহ নয়—অপর কেহই এ বিষয়ে অবগত ছিল না। আমিই তাহাকে হত্যা করি, কারণ সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। জুরী একমত হইয়া কানাইকে উভয়বিধ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ৩।২ এর অধিকাংশ মতে সত্যেনকেও দোষী সাব্যস্ত করে। সত্যেন ও কানাই উভয়েই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কানাই তাহার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করে নাই। কিন্তু কৌশলী এ. সি. ব্যানার্জি, নরেন্দ্রনাথ বসু ও রমনীমোহন ব্যানার্জি উকিলগণের সহায়তায় সত্যেনের আপীল মামলা পরিচালনা করেন। হাইকোর্ট সত্যেন ও কানাই উভয়েরই মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করে।

১৯০৮ সালের ১২ই নভেম্বর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কানাইয়ের ফাঁসী হয়। কিন্তু সত্যেনের আত্মীয়বর্গদ্বারা বড়লাটের দরবারে মৃত্যুদণ্ড রহিতের জন্য আবেদন করায়, তাহার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত থাকে।

সত্যেন তাহার মাতার মারফৎ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট আবেদন করে যাহাতে তিনি কারাভ্যন্তরে আসিয়া সত্যেনের মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকরী হইবার পূর্বে তাহাকে পূতাশিষে ধন্য করেন এবং তাহার আত্মার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। এই অনুরোধ পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় জেল সুপারিনটেনডেণ্টের অনুমতি লইয়া জেলে যান। জেলে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাঁহাকে ভালভাবে তল্লাসী করা হয় এবং তাহার পর একজন সার্জেণ্ট তাহাকে সত্যেনের কারাপ্রকোষ্ঠে লইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাকে সত্যেনের কারাপ্রকোষ্ঠে লৌহ গরাদের বাহিরে থাকিতে হয়। সত্যেন তাঁহার উপস্থিতিতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কারণ বাঙলাদেশের এই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সহিত সে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিল এই আশায় যে তিনি তাহার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ আনিয়া দিতে পারিবেন। পণ্ডিত শাস্ত্রীও মহান উদারতার সহিত ঐ মৃত্যু পথযাত্রী মুমুক্ষু তরুণকে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে মুক্তিলাভে সহায়তা করিলেন।

পারলৌকিক অনিশ্চয়তায় সত্যেনকে মনে হয় ঈষৎ বিচলিত দেখা গিয়াছিল। সে বলে—"আমাকে বলুন কিভাবে পরম শান্তিতে এই মরদেহ ত্যাগ করিব?" পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেন—"তোমার মহান ও পরম ধার্মিক পিতা ও জ্যেষ্ঠ তাতের কথা স্মরণ করো—তুমি তাঁহাদের নিকট পরম্ শান্তি ধামে যাইতেছ। জাগতিক সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করো, সমস্ত আসক্তি বিসর্জন দাও—তুমি জান যে এ জগৎ তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে অতএব তাহার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার তরফে যে আপীল রুজু হইয়াছে, তাহার উপর ভরসা রাখিও না। তোমার মরণ অনিবার্য্য। তোমার সুবিখ্যাত জ্যেষ্ঠতাত রাজনারায়ণ বসুর কথা স্মরণ করো—ভগবানে ভরসা রাখ। অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের মার্জনা ভিক্ষা করো এবং বীরের মত মৃত্যু বরণ করিয়া নাও। ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিও।"

পণ্ডিত শাস্ত্রী তাহার পর বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন এবং শাস্ত্রীয় অন্যান্য ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সার্জেণ্ট ও অন্যান্য সকলে নীরবে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে দণ্ডায়মান ছিল। পণ্ডিত শাস্ত্রীর উপদেশ মতে সত্যেন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে—" ঈশ্বর আমায় শান্তি দাও, নির্ভীকভাবে ও পরম শান্তির সহিত আমায়

মরিতে শিক্ষা দাও—আমায় শক্তি দাও হে সর্ব শক্তিমান বিভু। আমি পরজীবনের অনিশ্চয়তার চিন্তায় বিচলিত, কিন্তু আমি তোমার শান্তিময় লোকে যাইতে উৎসুক। তাহার পর হঠাৎ সত্যেন শীতল লৌহদ্বারে মস্তক ছোঁয়াইল। পণ্ডিত মহাশয় তাহার শিরস্পর্শ করিয়া আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন—"ঈশ্বর তোমায় কৃপা করবেন—আমি নিশ্চিত।" পণ্ডিত শাস্ত্রী পরে বলেন—মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সত্যেনের মধ্যে অসাধারণভাবে ঈশ্বরকে জানিবার বুঝিবার ও ঈশ্বরের কৃপালাভের স্পৃহা দেখা দেয়—এইরূপ মুমুক্ষ কখনও কোনো সাধারণ অপরাধীর মধ্যে দৃষ্ট হয়না। সত্যেনের পূর্ব-পুরুষগণ সকলেই পরম ধার্মিক ছিলেন—সেই ঐতিহ্যই তাহাকে ঐরূপ প্রেরণা দেয়।"

বড়লাট সত্যেনের তরফকৃত মার্জনার আবেদন অগ্রাহ্য করেন—রাজার নিকট অনুরূপ আবেদনও অগ্রাহ্য হয়। সত্যেনের মরদেহসহ কলিকাতার পথে একটি মিছিল বাহির করিবার উদ্যোগ হয়। কিন্তু পুলিশ উহার প্রতিবন্ধক হয়। ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর অতি প্রত্যূষে আলিপুর সেণ্ট াল জেলে ফাঁসী মঞ্চ গহ্বরের আবরণী হরিৎকাষ্ঠখণ্ডের উপর আরোহণ করিল। তাহার হাত পশ্চাতে বাঁধা ছিল এবং মুখমণ্ডল কৃষ্ণ বস্ত্রে আবৃত ছিল। তাহার পর এই দেশভক্তের জীবননাট্যে যবনিকা নামিয়া আসিল। তাহার মর দেহ ঘৃত, চন্দন কাষ্ঠ, নানাপ্রকার সুগন্ধি ও পুষ্প সহযোগে দাহ করা হইল। সত্যেনের আত্মীয়বর্গকে তাহার শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য ও তাহার উর্দ্ধগতির জন্য প্রার্থনা জানাইতে কারাগারে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তাহার দেহাবশেষ কিছু ভস্ম লইয়া যাইবার অনুমতি মিলিল না।

এইরূপে অগ্নিযুগে মেদিনীপুরের বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রকৃত নায়ক চিরযাত্রায় চলিয়া গেল—কিন্তু তাহার শহীদ জীবনের অমর প্রভাব রাখিয়া গেল, যাহার দ্বারা উত্তরপুরুষ ও অনুগামীরা প্রেরণা পাইয়াছিল—তাহার ত্যাগ, সংগঠন প্রতিভা, তেজ ও বীর্য্য তাহাদের পাথেয়স্বরূপ হইয়াছিল।

সত্যেনের পিতা ছিলেন অভয়চরণ বসু। অভয়চরণ কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মেদিনীপুর কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রায় ত্রিশবৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি মেদিনীপুরে গৃহনির্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন। উক্ত বাসগৃহটিই এখনও সত্যেনের আত্মীয় ও বংশধরদের বাসগৃহ। অভয়চরণের পাঁচ পুত্র ছিল—জ্ঞানেন্দ্রনাথ,

সত্যেন্দ্রনাথ, প্রঃ ভূ, ভূপেন্দ্রনাথ, প্রঃ কেদান, সুবোধকুমার এবং অপর একটি বালক। (তখন তাহার বয়স ছিল ১৩) সত্যেন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর আশী দশকের প্রথমের দিকে মেদিনীপুরে জন্ম গ্রহণ করে। সাফল্যের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিবার পর সত্যেন বি. এ. শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে, কিন্তু পরীক্ষা দেয় নাই। মৃত্যুর চার পাঁচ বৎসর পূর্বে কলেজ পরিত্যাগ করে এবং তাহার পর একবৎসর কালেক্টরীতে চাকুরী করে। তাহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার নামিত বন্দুক কাছে রাখিবার অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে মামলা হয়। ঐ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাহার দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। দণ্ডাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই মাণিকতলা বোমার ষড়যন্ত্র মামলায় তাহাকে মিঃ বিরলের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। এই অবস্থাতেই সে কানাইলাল দত্তের সহিত নরেন গোস্বামী হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে সে মেদিনীপুর অস্ত্র আইনের মামলার দণ্ডাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। সত্যেন অবিবাহিত ছিল। উল্লিখিত চারি ভ্রাতা ব্যতীত তাহার তিনটি ভগ্নী ও বিধবা মাতা বর্তমান ছিল। ভ্রাতাদের মধ্যে একজন তখন আমেরিকায় ছিল।

১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লীর দরবারে মহামান্য রাজা ও সম্রাট কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বিঘোষিত হইল। তিনি অনুজ্ঞা দিলেন যে অতঃপর দিল্লী ভারতের রাজধানী হইবে। বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার জন্য একজন পৃথক গভর্ণর নিযুক্ত হইবে এবং আসামের জন্য একজন পৃথক চীফ কমিশনার নিযুক্ত হইবে। ১৮৫৩ সালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ্যাক্টের পরিপোষকে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধন মূলে ঘোষণা করা হয় যে গভর্ণর জেনারেল আর বঙ্গদেশে ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর গবর্ণররূপে আখ্যাত হইবেন না এবং অতঃপর বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর জন্য পৃথক গবর্ণর নিযুক্ত হইবে। আর একটি অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া ঘোষণা করা হয় যে ১৮১২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর গবর্ণরের শাসনাধীনে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ, আসাম, বর্দ্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও দার্জিলিং জেলা থাকিবে। ১৯১২ সালের ১ লা এপ্রিল হইতে স্কারলিং-এর ব্যারণ কারমাইকেল গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। এইভাবে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিত রহিল।

বঙ্গভঙ্গজনিত সুদীর্ঘ আন্দোলনের কারণ এইভাবে অপসারিত হইল।

যদিও অপেক্ষাকৃত স্তিমিতভাবে, তথাপি ১৯০৯।১০ সালেও মেদিনীপুরে আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রহিল। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অংশে তখনও বিলাতী সামগ্রী বিক্রেতাদের গৃহদাহ করিয়া অথবা করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিলাতীবর্জনে তৎপর হইতে বাধ্য করা হইতেছিল। ঐসব আন্দোলনকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী নিযুক্ত হইল।

মেদিনীপুর বোমার মামলা বলিয়া কথিত মামলায় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ের একপ্রকার সমাপ্তি আসে। উদ্দীপনার প্রথম আবেগে বৃটিশকে ভারত হইতে বিতাড়নের গুরুত্ব অথবা ইহার দুরূহতার কথা সেভাবে বিবেচিত হয় নাই। ইহা ঠিকই যে শুধুমাত্র আবেগ অথবা উত্তেজনার দ্বারা বৃটিশ বিতাড়ন সম্ভব নহে। এই জন্য যখন অত্যাচারের নির্মম দণ্ড নামিয়া আসিল, তখন জনতার উৎসাহ উত্তেজনা থামিয়া গেল। বিগত আন্দোলনের নেতৃবর্গের কিছু নিশ্চিহ্ন হইল, কিছু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল ভীত হইয়া সরিয়া পড়িল, কিছু বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। বিগত আলোড়নের অব্যবহিত হেতুর আর অস্তিত্ব রহিল না। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া গেল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহা তরুণ মনে অম্লান দীপ্তিতে উজ্জল হইরা রহিল। ১৯১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মহরম মিছিলের মধ্য হইতে মেদিনীপুর বোমার মামলায় কুখ্যাত গুপ্তচর আবদুর রহমানের প্রতি একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহা বিস্ফারিত হয় নাই। ইহার কোনো প্রকার সূত্র আবিষ্কৃত হইল না। ১৯১২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে পুনরায় আবদুর রহমানের বাড়ীর সম্মুখে আর একটি অতি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হইল। ঐ বিস্ফোরণের ফলে আবদুর রহমানের বাটীর প্রাচীরে একটি বৃহৎ গর্তের সৃষ্টি হয়। ঐ ঘরে তাহার কন্যা ঘুমাইতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে অনাহত রহিল।

সমগ্র দেশব্যাপী কোথাও বৃহদাকার রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিতেছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘ তামস নিদ্রার পর মেদিনীপুরের যে যুবশক্তি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় প্রস্তুত রহিল। কর্তৃপক্ষের ইহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। শাসনযন্ত্রকে দৃঢ় করিবার জন্য কিছুটা করিয়া এলাকা লইয়া একটি করিয়া মণ্ডল স্থাপিত হইল এবং ঐ সকল মণ্ডলের জন্য একটি করিয়া বাছাই করা অফিসার নিযুক্ত হইল। পঞ্চায়েৎও চৌকিদারী ব্যবস্থা পরীক্ষা করা ও উহার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উহাদের উপর ন্যস্ত হইল। দুই অথবা তিনটি থানা লইয়া এক একটি মণ্ডল ও একজন করিয়া

মণ্ডলাধিকারিক সমগ্র জেলায় সৃষ্টি হইল। প্রাচীন পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থাও নিয়মিত তত্ত্বাবধানের এবং সংহতির অভাবে উহা হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। মণ্ডলাধিকারিক নিযুক্ত করিয়া সুনিয়মিত তত্ত্বাবধানের ফলে পঞ্চায়েৎ চৌকিদারী শাসনব্যবস্থার উন্নতি হইল এবং তৎসহ শাসন ব্যবস্থা সুদূর পল্লী অঞ্চলেও সুদৃঢ় হইয়া ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক তৎপরতার সম্মুখীন হইবার জন্য সরকারকে উপযুক্ত যন্ত্র সৃষ্টি করিল।

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে মেসারস্ রডা এণ্ড কোং নামক অস্ত্র বিপনের জন্য প্রেরিত পঞ্চাশটি মশার পিস্তল এবং ছেচল্লিশ হাজার রাউণ্ড গুলি কলিকাতার ডক হইতে প্রেরণকালে অপহৃত হইল। প্রায় অর্দ্ধেকগুলি কার্টরিজ পুলিশ পুনরায় হস্তগত করে। ত্রিশ সালের বিপ্লব আন্দোলন পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি বিপ্লবী ক্রিয়াতেই মশার কার্টরিজ ব্যবহৃত হয় দেখা যায়। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে ঐ সব অপহৃত অস্ত্রশস্ত্র ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বিপ্লব সংস্থার মধ্যে বণ্টন করা হয়। ঢাকার শ্রীসঙ্ঘ দল যে সমস্ত অস্ত্র লাভ করে সেগুলি উহার সভ্যরা ভবিষ্যতে মেদিনীপুরে ও অন্যত্র বৈপ্লবিক ক্রিয়াতে ব্যবহার করে। প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবীরা এই প্রথম প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পায় যাহার দ্বারা তাহাদের ত্রিশ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে শক্তি অর্জ্জিত হয়।

বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া গেল। বাঙলার বিপ্লবীদল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমবেত হইল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তিতে চরম আঘাত হানিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা বালেশ্বরের অদূরে বুড়ীবালামের রণক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত হইল। গ্রামবাসীগণকে মিথ্যা করিয়া বুঝান হইয়াছিল উহারা দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত। তাই তাহারাও কর্ত্তৃপক্ষকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়তা করে। বিপ্লবীরা তাহাদের অসীম সাহসী নেতা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অসংখ্য ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্য ও গ্রামবাসীর সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া এবং অসংখ্য অরাতি নিধন করিয়া মহৎ প্রাণ অঞ্জলী দিল দেশ-মাতৃকার পূজাঙ্গনে।

এই সংগ্রাম ব্যর্থ হইলেও বাঙলার উপর উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সমগ্র দেশ সময়োচিত তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হয়। মিত্র শক্তি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক বলিয়া আত্মপ্রচার করে কিন্তু ভারতের চরমপন্থীরাও ঐ প্রচার নিজেদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে ব্যবহার করিতে সুরু করিল। তাহারাও ভারতীয়ের জন্য এই লক্ষ্যে দ্রুত উপনীত

হইবার অমোঘ দাবী উপস্থাপিত করিল। সরকারের বিরাম বিহীন নিন্দা তরুণ মনে বিদ্বেষ ও বিরাম সৃষ্টি করিতে বাধ্য। এদিকে মধ্যপন্থী ভারতীয়দের সহিত সরকারের হৃদ্যতা ও উহাদের রাজানুগত্য ক্রমশ বর্দ্ধিত 'হইতে লাগিল। কিন্তু উহাদের শক্তিও ক্ষয়িত হইতে লাগিল বিরতি বিহীন সমালোচনার উত্তাপে।

এক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ পায়—"বাঙলাদেশে এমন এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয় যাহার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত আদালতের সাধারণ বিচারে দোষীর দণ্ড বিধান সম্ভব হয়। যদিও পুলিশ আসামীর স্বীকারোক্তিরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইত এবং অনেক সময় নাটকীয়ভাবে অপর স্বীকারোক্তিদ্বারা প্রথমোক্ত স্বীকারোক্তি সমর্থিত হইত এবং যদিও ঐসব স্বীকারোক্তি এমন সমস্ত অবস্থায় পাওয়া যাইত যাহাতে পুলিশের পীড়ন প্রভৃতির দ্বারা উহা গৃহীত অনুমান করে চলে না, তথাপি অপরোধীর শাস্তিবিধান সম্ভব হইত না। বিচারকালে ঐ সমস্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত হইত। যে সমস্ত ব্যক্তি অসাধারণ সাহসে ভর করিয়া বর্ক্তৃতা মঞ্চে অথবা পত্র পুস্তিকাদিতে বিপ্লব প্রচেষ্টার নিন্দা করিতে তৎপর, তাহারাও সুযোগ মত সাক্ষ দেওয়ার দায় এড়াইবার জন্য অপরাধের ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে বিলম্ব করিত না। গুপ্তচর ও ডিটেকটিভবৃন্দই ঐসব বিপ্লব আন্দোলনের সংবাদাদি রাখিত ও উহা বানচাল করিবার উৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতের বিচারে তাহাদের সাক্ষীরূপে তুলিয়া সর্ব্ব সাধারণে তাহাদের পরিচিত করা চলিত না অথবা ঐভাবে বিপ্লবীদের রিভলভারের অতর্কিত আগুণে উহাদের মুখোমুখি করিয়া দেওয়া চলিত না।"

ফলে ১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন জারী হইল এবং বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক বিপ্লবীকে ঐ আইনের সাহায্যে অন্তরীণ করা হইল। কিছু কিছু বিপ্লবীকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানায় অন্তরীণ করা হইল। যদিও মেদিনীপুরে এই সময়টিতে বিশেষ কোনো সক্রিয় বিপ্লব প্রচেষ্টা হয় নাই, তথাপি ঐ সমস্ত বিপ্লবী তাহার অপরিমিত ত্যাগের ও বীরত্বের জীবন্ত আদর্শরূপে নিজ নিজ অন্তরীণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে জনমনে বিশেষ রেখা অঙ্কিত করিতে লাগিল এবং ঐ প্রভাব ভবিষ্যৎ আন্দোলনের বীজরূপে উপ্ত হইল।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয়, নীরেন এবং অপর দুই জন দীর্ঘকাল ধরিয়া পুলিশের খাতায় নরহত্যাকারী বলিয়া উল্লিখিত ছিল। উহারা পশ্চাৎ

অপসরণ কালে উড়িষ্যায় পুলিশী চক্রবুহে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড সংগ্রামে উহাদের একজন নিহত হইল এবং অপর একজন নিদারুণভাবে আহত হইয়া পরে মৃত্যুবরণ করে। ভারতরক্ষা আইনমতে অপর তিনজনের একটি বিশেষ আদালতে বিচার হয়। উহাদের দুইজনের মৃত্যু দণ্ড এবং একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্ম্মানদের সহায়তায় সুদূর প্রাচ্যে একটি পরিকল্পনা করে যাহার দ্বারা তাহারা ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করে। ঐ ষড়যন্ত্রের নায়ক এই অভিযোগে বাংলাদেশের ১৯ জন ধৃত হয় এবং তাহাদের ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশান মতে বন্দী করা হয়।

মহাযুদ্ধ চলা কালে মহাত্মা গান্ধী পুরোভাগে আসেন এবং ইংরেজ যখন মহাআহবে বিপন্ন সেই সময় তাহাকে নিজেদের দাবী দাওয়া জানাইয়া বিপন্ন করা সঙ্গত নয় বলিয়া দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। তিনি দেশবাসীকে ইংরাজের সংগ্রাম শক্তিকে যাথাসাধ্য সাহায্য দিতে আহ্বান জানান। কংগ্রেস তাঁহার নীতি গ্রহণ করে। কংগ্রেসের ঐ আহ্বানে বাঙলার যুবশক্তি সাড়া দেয় ও যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা করিতে আগাইয়া আসে। মেদিনীপুরের বহু তরুণও যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যদলে গৃহীত হয়। কিন্তু মেদিনীপুরকে সরকার বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না রাজনৈতিক স্তব্ধতার ঐ মাহেন্দ্রক্ষণে তাই উৎকৃষ্ট শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে মেদিনীপুর জেলাবিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব্ব সরকার সুরু করে। ১৯১৩ সালে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়া জনমতের জন্য জনসাধারণে প্রকাশ করা হইল। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থাগুলির ও ব্যক্তি বিশেষের মতামত বিবেচনার পর এবং এই বিষয়ে নিযুক্ত বেঙ্গল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কমিটির সুপারিশ মতে একটি সংশোধিত খসড়া প্রকাশিত হইল—উহা এইরূপ :—

(১) ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং মেদিনীপুর সদর লইয়া মেদিনীপুর সহরকে সদর করিয়া মেদিনীপুর জেলা হইবে। ইহার পরিধি হইবে ২,৬৮৮ বর্গমাইল এবং জনসাখ্যা ১,০৮৮,৪৪৭

(২) খড়্গপুরে সদর এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল এবং কাঁথি ও তমলুক মহকুমা লইয়া হিজলী জেলা হইবে। ইহার মোট পরিধি ২৪৫৭ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ১,৭৩২,৭৫৪ হইবে। কিন্তু মেদিনীপুরের জেলা ও দায়রা জজের এক্তিয়ার উভয় জেলার উপর থাকিবে এবং তিনি উভয় জেলার যাবতীয়

মামলার বিচার করিবেন। সাধারণের অবগতির জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রচার করা হইল। ইহার জন্য ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাবও প্রস্তুত হইল।

মিসেস এ্যানি বেসাণ্ট কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ১৯১৭ সালে হোমরুল আন্দোলন সুরু করেন। মেদিনীপুরে ঐ আন্দোলনের স্বপক্ষে একটি বিশেষ কার্য্যকরী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস এ্যানিবেসাণ্ট মেদিনীপুর পরিদর্শনে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইতিমধ্যে সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হইয়া হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্যও সংস্থাপিত হয় নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় মতাবলম্বীই ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন। মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সালের আগষ্টে তাহার ঘোষণা করেন। ঐঘোষণা দ্বারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশরূপে ভারতে ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের শাসনযন্ত্রের সর্ব্বাংশে ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হইবে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাগুলিতে তৎপূর্ব্বে ভারতীয়দের করায়ত্ত হইবে। এইরূপ আরও ঘোষিত হয় যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা যতশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করা হইবে। দুইটি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ঐ পরিবর্ত্তন ধাপে ধাপে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ কখন ও কতখানি পরিবর্ত্তন হইবে সে বিষয়ে একমাত্র সরকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭-১৯১৮ সালের শীতকালে ভারতে আসেন ও সাক্ষ্য ও জবানবন্দী আদি গ্রহণ করেন। অন্যান্য দল সংস্থার সহিত জাতীয় নেতাগণও তাঁহাদের মতামত তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। দেশবন্ধু একটি দৃঢ় পরিকল্পনা করেন। তিনি অর্থের উপর এবং দেশের আমলাতন্ত্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করেন। তিনি কিছু দিনের জন্য ইংরাজ সরকারের হাতে সৈন্যদল, নৌ-সৈন্যদল ও রেলওয়ের কর্তৃত্ব রাখিতে রাজী হন।

১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ সালের ১৯ তারিখেই রাউলার্ট কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী রিপোর্ট এ বিবৃত হয় কিভাবে ১৯১৫ সালে কতগুলি বাঙালী যুবক একটি বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত করে এবং ভারতের অভ্যন্তরে গোলযোগ সুরু করিতে না পারিয়া কিভাবে সক্রিয়ভাবে বৈদেশিক সহায়তা পাইবার ও তৎদ্বারা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা করিয়াছিল তাহার বিবরণ। আরও বলা হয় যে ঐ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয় নাই। ঐ রিপোর্টে এই

আন্দোলন দমন করিবার বিশদ উপায় সমূহ বিবৃত হয় এবং বেপরোয়া বিপ্লবীদের দমন করিবার কথা বলা হয়। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয় যে স্বায়ত্ত শাসনশীল সংস্থা সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে শান্ত করিবার জন্য অনুমোদন করা হয়। ঐ নব সংস্কারগুলির মর্মার্থ এইরূপ—"আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমানে সেই সময় আসিয়াছে যখন ভারতের জাতীয় সত্ত্বার হানি না করিয়া ভারতবর্ষকে পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের পক্ষপুটে রাখা সম্ভব নহে ভারতের জনগণকে আমরা বহু মূল্যবান সামগ্রী দিয়াছি এবং আরও অনেক কিছু আমাদের দিবার রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের জাতীয় সত্ত্বার বিকাশ এদেশে অশ্রুতপূর্ব্ব। ভারতের বৃহত্তর জনসমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার মধ্যে এই জাতীয় সত্ত্বার বিকাশ সম্ভবপর নহে এবং সেইজন্য অবজ্ঞা ঘৃণার মনোভাবকে নষ্ট করিয়া আমরা ভারতের বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণে ব্রতী হইয়াছি।"

"সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজ ও স্বশাসন ভারতের জনগণের চরম আকাঙ্ক্ষা-রূপে দেখা দিতে পারে এবং এ বিষয়ে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাহাকে সাহায্য করিতে আমরা প্রস্তুত। আমরা স্বীকার করি যে ইহা ব্যতীত ব্যবহারিক ও ও নাগরিক জীবনে পূর্ণতা আসিতে পারে না এবং যে কোনো আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ জাতি ইহা ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না অথবা তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য এতাবৎ ভারতবাসী যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিল, সেইসব বিষয়ে তাহারা মতামত ব্যক্ত করিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে অধিকারী হইবে।"

রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করা হয় কিন্তু সর্ব্বভারতীয় শাসন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন অনুমোদিত হয় নাই।

কংগ্রেসের মধ্যে নরম পন্থীরা এই রিপোর্টকে খুবই উল্লাসের সহিত স্বাগত জানাইল। কিন্তু চরমপন্থীরা ঐ রিপোর্টকে সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক অভিহিত করিল—এই বিপরীত মনোবৃত্তির ফলে নরমপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে কংগ্রেস উভয় রিপোর্টই বর্জ্জন করিল এবং ভারতে প্রকৃত স্বরাজ দাবী করিল ও রাউলাট কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাহার করিবারও দাবী জানাইল। ইতিমধ্যে তিলকের নেতৃত্বাধীনে হোমরুল আন্দোলন বিস্ময়করভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিল।

১৯১৯ সালে ভারতের ইউরোপীয় অধিবাসীগণ ও আমলাগণ শাসন সংস্কারে ঘোরতর আপত্তি জানাইল। ফলে মিঃ মণ্টেগুকে প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের বহু-বিষয় প্রত্যাহার করিতে হইল।

১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ আমলাদের ভোটের আধিক্যে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে রাউলাট বিল আইনে পরিণত হইল। প্রতিবাদে কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করিল।

মহাসমরের অবসানের অব্যবহিত পরেই ভারতীয় মুসলমান সমাজ মিত্র শক্তির দ্বারা তুর্কীর সুলতানের নিগ্রহের প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিল। তাহারা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফৎ ও হোমরুল আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। মিসেস এ্যানি বেসাণ্ট, মৌলনা মহম্মদ আলি এবং সৌকত আলি এই সময় মেদিনীপুরে আসিলেন ও স্বাভাবিকভাবেই উপযুক্ত ও প্রবল অগ্রহে মেদিনীপুরবাসী কর্ত্তৃক বৃত হইলেন। মেদিনীপুরের জনমানস এইভাবে ১৯১৮-১৯১৯ সালে প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই সব আন্দোলনের অবদমনের জন্যই রাউলাট বিল আইনে পরিণত হইল। ইহার পরই ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ঐতিহাসিক ও পৈশাচিক জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। রাউলাট বিল কোনো স্থানীয় সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই ঐ আইনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন আবশ্যক ছিল। মহাত্মা গান্ধী ভারতে জন-জাগরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণ যাহাতে হিংসায় উন্মত্ত না হইয়া পড়ে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলেন অবশেষে তিনি ঐ বর্ব্বর ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্ব্বভারতীয় স্তরে হরতাল পালন করিয়া দোকানপাঠ বন্ধ রাখিয়া এবং স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবাহ স্তব্ধ করিয়া জাতীয় শোক পালনের আহ্বান জানাইলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যা সমস্ত জাতিকে প্রচণ্ডবেগে নাড়া দিল এবং জাতিকে জাগাইয়া তুলিল। বহু মনীষি উহার প্রতিবাদে তাঁহাদের সরকারী খেতাব ও পদবী বর্জ্জন করিলেন। আইন ব্যবসায়ী তাঁহাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন, ছাত্ররা স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিল এবং সহস্র সহস্র নগরবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঐ শয়তান প্রকৃতির সরকারেরর সহিত অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য করিয়া প্রতিরোধ আন্দোলনের বাণী প্রচারে ব্রতী হইল। ঘুমন্ত জাতি সাহস অবলম্বন করিয়া আত্মত্যাগে উন্মুখ হইয়া পড়িল। দেশের সর্ব্বত্র বিদেশী বস্ত্রের প্রজ্জ্বলিত

হুতাশনে সহস্র বর্ষের তমিস্রা বিদূরীত করিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিল। সহস্র সহস্র গৃহে চরকার ঘর্ঘর শব্দ যেন যজ্ঞশালার মন্ত্রের মত মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরুষের পার্শ্বে নারীর দলও তাহাদের শত সহস্র বর্ষের পর্দ্দা বিসর্জ্জন দিয়া পথে পথে শোভাযাত্রা করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি ধৃত হইল কিন্তু আরও বহু সহস্র ব্যক্তি গ্রেপ্তার বরণ করিতে প্রস্তুত হইল। ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামের যজ্ঞশালায় মেদিনীপুরবাসী যথাযোগ্যভাবেই সমিধ কাষ্ঠ যোগাইয়াছিল—সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।